|প্র|ব|ন্ধ|

নেতাজী সুভাষ বসু

আরিফ খান মিরণ

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঘটন ঘটনপটিয়সী এই নায়ক সম্বন্ধে কম-বেশি সবাই জানে। তবুও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র এখনও ভারতীয়দের কাছে এক রহস্য। অসংখ্য গবেষণাকর্মে তার জীবনের নানা অজানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু যতটা না উন্মোচিত হয়েছে, অন্ধকারে রয়েছে তারচে' অনেক বেশি

সুভাষ চন্দ্র বসু : বার্লিন, ১৯৪১

১.

২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭, শনিবারে মধ্যবেলায় সুভাষ চন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ওরিয়া (oriya) বাজারের কটক (cuttack) নামক এলাকা। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তখন রমরমা অবস্থা। রানী ভিক্টোরিয়া তাঁর শাসনামলের হীরকজয়ন্তী উদযাপন করছেন আর ভারতীয়রা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে রানীর 'মহান, উদার রাজ ক্ষমতার' প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। অন্যদিকে একই সময়ে পুনায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম সহিংস আন্দোলনকে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গেই দমন করা হল। এই আন্দোলনের নেতা তিলককে মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগে নির্বাসনে পাঠানো হল। সুভাষের বালক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবেন যিনি, স্বামী বিবেকানন্দ, ফিরে এলেন আমেরিকা থেকে একই সময়ে। অসংখ্য হিন্দু সন্যাসীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কানাকড়ি ছাড়াই সেখানে যান এবং প্রায় রাতারাতি একজন আধ্যাত্মিক কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হন। সুভাষের জন্মের আর মাত্র দুই বছর পরই জন্মগ্রহণ করবে ভারত মাতার আর এক বিদ্রোহী সন্তান কাজী নজরুল ইসলাম।

বিশাল বসু পরিবারে সুভাষের জন্ম খুব বেশি একটা গতি সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মা প্রভাবতী দেবীকে যথেষ্ট ধকল সইতে হয়েছিল। এ উপলক্ষে সুভাষের বাবা জানকীনাথ তাঁর ডায়রিতে লেখেন, 'যা হোক এ যাত্রায় বেচারা পার পেল'। সুভাষের জন্মটা তাঁর বাবার কাছে 'নোট করে রাখার মত কোনো ঘটনা নয়, গতানুগতিক ব্যাপার'- একথা তিনি ডায়েরিতে লেখেন সুভাষের জন্মের আগের দিন। সে ছিল নয় ছেলে মেয়ের মধ্যে ষষ্ঠ ছেলে (আরো অনেকে জন্মের পরপরই মারা গিয়েছিল)। জানকীনাথের বিশাল পরিবার। তিনি বারের একজন সুখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। ওরিয়া বাজারে জানকীনাথের বাড়ি খুঁজে বের করা কোনো কষ্টকর কাজ ছিল না; বাজারের সবাই এক নামে জায়গাটা চিনত। বাড়িটি ছিল বাজারের ছিমছাম পরিবেশে একটি ঝাঁকালো বাঙালি স্থাপনা।

জানকীনাথ ইংরেজ অনুগামী লোক ছিলেন। শুধু তিনিই নন, তাঁর সময়কালে ভারতীয় এবং ব্রিটিশদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় রাজশক্তি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারল যে এদেশে তাদের দোসর বা কোলাবরেটর তৈরি করাটা খুব একটা মন্দ কাজ নয়। ফলে দেশে তারা একটি 'জানকীনাথ গোষ্ঠী' তৈরি করল। যারা মনে করত ব্রিটিশ শাসন ভারতের জন্য আশির্বাদস্বরূপ। জানকীনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন যে তিনি ভাবতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। এই শাসনের অধীনে ভারত উন্নতি করবে। অবশ্য তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে জানকীনাথের এই চিন্তা বেশির ভাগ শিক্ষিত ভারতীয়দের চেয়ে খুব বেশি আলাদা কিছু ছিল না।

ব্রিটিশানুগত জানকীনাথ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন উদার ও সদগুণাবলী সম্পন্ন। সরকারি চাকরির সুবাদে আর্থিক অবস্থা ছিল রমরমা, ফিটন গাড়িতে চড়তেন, টেনিস খেলতেন, সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ ছিল। নাতি-নাতনিদের কাছে তিনি ছিলেন দাদা ভাই, কিছুটা খোলামেলা, প্রশ্রয়দাতা স্বভাবের মানুষ। ছেলেদের কাছে, বিশেষ করে সুভাষের কাছে তিনি ছিলেন 'বাবা', কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির। যখনই তিনি রুমে প্রবেশ করতেন সুভাষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাত, আর সম্বোধন করত 'আপনি' বলে। অবশ্য মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। মাকে সে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করত। মায়ের সাথে কোনো

বিষয় নিয়ে আলোচনা, তর্ক, এমন কি দ্বিমত পোষণ করা চলত।

এক সংসারে এত ছেলেমেয়ে, সুতরাং মা-বাবা কারো প্রতিই বিশেষ কোনো নজর দিতেন না। সুভাষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল সারদা নামের একটি কাজের মেয়ে। মেয়েটি সুভাষকে 'রাজা' বলে ডাকত এবং তার দেখাশুনা করত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সুভাষ একজন নিঃসঙ্গ শিশু হিসেবে বেড়ে উঠতে লাগল। তার বেশির ভাগ সময় কাটত পড়াশুনা করে এবং সিঁড়িঘরের উপরে ছোট্ট প্রার্থনা রুমে প্রার্থনা করে। সে তার রুটির অংশ হতে কিছু অংশ কাপবোর্ডে জমিয়ে রাখত পরবর্তীতে গরিব প্রতিবেশীদের দেওয়ার জন্য।

সুভাষ ১৯০২ সালে প্রথম স্কুলে যাওয়া শুরু করে । তখন তার বয়স পাঁচ বছর। পুরোপুরি বাঙালি পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে সে গিয়ে পড়ল পুরোপুরি ইংরেজ পরিবেশে। স্কুলটা ছিল ব্যাপটিস্ট চার্চের পরিচালনায় একটি প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয় স্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ বছর ভারতে কাটিয়েও এখানকার স্থানীয় ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি। বেশির ভাগ এ্যাংলা-ইন্ডিয়ান ছাত্রই ভারতীয়দের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। ওদের হাবভাব সবসময় এমন থাকত যেন ওরা খোদ ইংরেজদের চেয়েও সাচ্চা ইংরেজ। খেলাধুলা ছিল স্কুলের কারিকুলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু সুভাষ এ বিষয়ে ছিল একেবারেই দুর্বল। সুভাষের মৃত্যুর পর তাঁর যে আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, ভারত তীর্থযাত্রী (The Indian pilgrim), তাতে সেই ইংরেজিয়ানা পরিবেশের প্রতি তাঁর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। অবশ্য স্কুলে থাকাকালীন তিনি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন একজন 'আদর্শ ছাত্র' হওয়ার জন্য। এ্যাংলা-ইন্ডিয়ানরা ছিল তাঁর কাছে অনুসরণীয় আদর্শ মানুষ আর তিনি ভারতের ইতিহাসের চেয়ে ব্রিটিশদের ইতিহাসটা বেশি জানতেন, ভালো জানতেন। পরবর্তীতে তাঁদের এই ইংরেজি-ইংরেজি মানসিকতার কথা মনে করে সুভাষ ও শরৎ (বড় ভাই) হাসাহাসি করতেন। তখন সুভাষ পোশাক ও আদর্শ দুটোতেই ভারতীয়, শরৎ আদর্শে ভারতীয় কিন্তু পোশাকে পাশ্চাত্য।

১৯০৯ সালটা সুভাষের জন্য একটা আনন্দঘন বছর। কারণ এই বছরই সে র‍্যাভেনশ কলিজিয়েট স্কুলে (Ravenshaw Collegiate School) বদলি হয়ে আসে। এই স্কুলে ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষার পর্যায়ে 'বাঙলা' ছিল আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়। নতুন স্কুলে 'ভারতীয়ানা' পরিবেশে তিনি দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা তাঁকে অপরাপর বাংলা ছাত্রদের চেয়ে ভিন্ন একটা অবস্থানে নিয়ে যায়। খেলাধুলা বলতে (যে বিষয়টাতে সুভাষ ছিল অসম্ভব কাঁচা) কিছু সময়ের জন্য নিষ্ফল অনুশীলন- এটা তাঁর জন্য খুব সমস্যার কিছু ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি তিনি বাংলাভাষার জটিল বিষয়- আশয়ে দক্ষতা অর্জন করে ফেললেন। অবশ্য, যদিও তিনি বাড়িতে এই ভাষাতেই কথা বলতেন, তবে এর আগে বাংলাভাষার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা গ্রহণ করা হয়ে ওঠেনি। তাঁর বাবার বিশাল সুনাম র‍্যাভেনশ

নেতাজীর মা : প্রভাবতী

কলেজে আসার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প তৈরি হতে লাগল। সুভাষের সংস্কৃত শিক্ষককে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তিনি সুভাষকে একশ'তে একশ' নম্বর দিয়েছেন? শিক্ষক উত্তর দিয়েছিলেন, 'কারণ তাকে একশতে একশ' দশভাগ নম্বর দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি ছিল না, পারলে তাই দিতাম।'

স্কুলে ছিলেন প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। কিশোর সুভাষ প্রথমেই যার প্রেমে পড়েছিলেন তিনি হলেন এই ব্যক্তি। তাঁকে সুভাষের আধ্যাত্মিক গুরু বলা যায়। বেণীমাধব তাঁর সামনে হিন্দু পুরাণ ও কিংবদন্তির স্বর্গরাজ্য খুলে দেন। তিনি সুভাষকে উপদেশ দিয়েছিলেন সে যেন নিজেকে প্রকৃতিতে আবিষ্কার করে। কয়েক বছর পর কিশোর সুভাষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য খুঁজে বেড়াতেন নির্জন পাহাড়, নদীর তীর ও জনমানবহীন অরণ্য। সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন কটকের পাশের নদী তীর ধরে হাঁটতে। সাথে থাকত আরভিং ওয়াশিংটনের 'স্কেচবুক' (Sketchbook), গুইসেপ মাজিনির 'ডিউটিস অব মেন', সেমুয়েল স্মাইলের 'দ্য সিক্রেট অব সাকসেস' এবং এডওয়ার্ড গিবনের 'ডিক্লাইন এন্ড ফল'। মাঝে মাঝে প্রকৃতির রূপে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যেতেন যে তিনি কবিতা আবৃত্তি করে উঠতেন। কবিদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পনের শতকের সংস্কৃত ভাষার কবি কালিদাস প্রমুখ। তিনি হিন্দু পুরাণ রামায়ন ও মহাভারত থেকেও আবৃত্তি করতেন।

সুভাষের বয়স যখন পনের তখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হন। বিবেকানন্দ ছিলেন অল্পবয়সী একজন হিন্দু সাধু কিন্তু তাঁর কথায় আছে ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা। তিনি ইংরেজি শিক্ষিত সাধু যে কিনা পশ্চিমাদেশ ভ্রমণ করে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। ভারত, ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মুক্তি-স্বাধীনতা, ভারতের তরুণ সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য সুভাষকে প্রভাবিত করেছিল।

বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনও সুভাষকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে যৌন জীবন নিয়ে চিন্তায় কিশোর সুভাষ যখন অস্থির তখন বিবেকানন্দের নিষ্কাম জীবন-যাপন তাঁর কাছে একটা সমাধানমূলক মলম মনে হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি যখন ইউরোপে নির্বাসন জীবন যাপন করছিলেন তখন অনেক ইউরোপিয়ান মহিলার কাছাকাছি এসে মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল যে একেবারে যাজক জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক বা মূল্যবান ছিল।

বিবেকানন্দের ধর্ম প্রচারের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল গরিবকে সাহায্য করা, গরিবই ভগবান ইত্যাদি । সুভাষেরও এমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি স্কুলের আট-দশজন বন্ধুকে নিয়ে 'স্বেচ্ছা সেবা সংঘ' নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। তাদের কাজ ছিল কটকের আশপাশের স্পলপক্স ও কলেরা রোগীদের সাহায্য করা। প্রতি রবিবার তারা অবৈতনিক ছাত্রাবাসের ছেলেদের মাঝে ফ্রি-চাল বিতরণ করতেন।

বঙ্গভঙ্গের সময়টাতে রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল বিস্ফোরনুখ। এই ঘটনায় ব্রিটিশদের পণ্য বর্জন শুরু হয় এবং গোপন বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু এ সকল কিছুই সুভাষকে ছুঁয়ে যায়নি। তখন তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে খুব কমই জানতেন এবং বাড়িতে এ জাতীয় আলাপ আলোচনায় রেওয়াজ ছিল না বললেই চলে। বিবেকানন্দ'র চিন্তাধারা তাঁর ভেতরে যে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল তা তাকে ধর্ম ও মায়ের কাছাকাছি নিয়ে আসে। তবে বিবেকানন্দের প্রভাবে তার পড়াশুনার মারাত্মক অবনতি ঘটে। চার-চারজন গৃহশিক্ষক রেখে দেওয়ার পরও ছেলেকে পন্ডিত বানানোর দিকে খুব একটা আকৃষ্ট করা গেল না। তখনও সে পুরোপুরি বিবেকানন্দ মোহে আক্রান্ত। তারপরও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সুভাষ অসাধারণ ভাল রেজাল্ট করে। তিনি সব সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পছন্দ করতেন এবং রেজাল্টও ভালো করতেন। এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। মা-বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবেন। ১৯১৩ সালের বর্ষা ঋতুতে যখন তার বয়স সাড়ে ষোল, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা শুরু করলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর মনে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল না আসলেই সে জীবনে কী হতে চায়।

সুভাষ যখন কলেজে পড়াশুনা করতে এল তখন অরবিন্দুর লেখা ব্যাপকভাবে পঠিত হত। অরবিন্দু বিবেকানন্দের অনুসারী বিপ্লবী কংগ্রেস নেতা। সুভাষ অরবিন্দুর যোগ (Yoga) এবং 'অভ্যন্তরীণ বৈশ্বিক শক্তি' অর্জনের ওপর বিভিন্ন গূঢ় ও দুর্বোধ্য লেখার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিল। এসব থেকে এক সময় ভেতরে চেতনা এল যে এখন তাঁর সত্যি সত্যি একজন গুরু দরকার।

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন উত্তর ভারতের দিকে গুরুর খোঁজে। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে তার প্রথম বর্ষ মাত্র শেষ হল। উত্তর ভারত ছিল তখন ভারতীর গুরুদের সুপার মার্কেট। হেমন্তর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল এসব জায়গায় যাওয়ার, ফলে ভ্রমণে কোনো ঝামেলা হয়নি। তাঁরা দু'জনে পবিত্র তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর এদিকে পরিবার থেকে পাগলের মতো খোঁজা হচ্ছে তাদের। জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ করা হল। দিকে দিকে লোক পাঠানো হল তাঁদেরকে খুঁজে বের করার জন্য।

এই গুরু খোঁজার ভ্রমণে সুভাষের অসাধারণ একটা উপকার হয়েছিল। কিছু সন্ন্যাসী তাদেরকে সাধুবেশে বিপ্লবী মনে করেছিল। একটি খাবার ঘরে তাদেরকে খাবার দেওয়া হয়নি কারণ তারা বাঙালি। বাঙালিরা নোংরা হয়। আরেক জায়গায় খাবার আলাদা করে দেওয়া হতো, এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে এক সাথে বসে খাবার খেত না। এবং গ্রামের যে কূপ হতে ব্রাহ্মণরা পানি তুলত সেই কূপ অব্রাহ্মণদের জন্য স্পর্শ করা নিষেধ ছিল। সাধু হওয়ার নিয়ত নিয়ে বেরিয়ে এসব দেখে সুভাষ খুব মর্মাহত হলেন।

বাড়ি ফেরার পর এক আবেগপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। ওড়িয়া বাজারের মাঝামাঝি মায়ের সাথে দেখা হয়। যখনি মায়ের পা স্পর্শ করলেন তিনি কেঁদে ওঠেন এবং বলেন, 'মনে হয় তুই পৃথিবীতে এসেছিস আমাকে জ্বালিয়ে মারতে।'

তাঁর বাবা তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং রুম পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। রুমে ঢুকে সে বন্ধু হেমন্তকে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদল। শুয়ে পড়ার পর হেমন্ত তাঁর পা দুটো ম্যাসেজ করে দিলেন। হেমন্ত'র মনে হচ্ছিল সুভাষ যেন স্বর্গীয় শান্তি পাচ্ছে।

তীর্থ ভ্রমণের দরুন সুভাষ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে যায় এবং টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও শুরু হল এবং তখনকার মত গুরু খোঁজার মিশন শেষ। পরবর্তীতে আত্মজীবনীতে তিনি এই মুহূর্তটাকে তাঁর 'পরিবর্তনের কাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য গুরু খোঁজার কাজ তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেননি, আমরা দেখব একজন আধ্যাত্মিক গুরু পাওয়ার আগেই তিনি মনের মত একজন রাজনৈতিক গুরু পেয়ে গেছেন।

২.

পুরোদমে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এই উদ্দেশ্যে সুভাষ কলকাতায় ফিরে এল। হেমন্তকে সে বলেছিল বি.এ (অনার্স) ক্লাসে ফিলোসফিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ পর্যায়ে সে বন্যাত্রাণ কার্যক্রমে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। একটি কলেজ ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেছিল এবং ভারতীয়দের আত্মনির্ভরতা অর্জনের কৌশল হিসেবে বিতর্ক সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করেছিল। তাঁর ভাষায়, 'আমরা ভারতীয়রা আমাদের কাজের, দৃষ্টিভঙ্গির, উদ্যোগের, সবকিছুর জন্য অন্যের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিতর্ক চর্চার অভ্যাস আমাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উদ্দীপিত করবে।' এ কথা সে বলেছিল দিলীপ রায়কে (বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক দিজেন্দ্রলাল রায়ের ছেলে)। সুভাষ দিলীপের কাছে গিয়েছিল তাকে বিতার্কিক হিসেবে যোগদানের আহ্বান জানাতে। অবশ্য এর কয়েক বছরের মধ্যেই দিলীপ সুভাষের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে হেমন্ত'র জায়গা দখল করে নেয়।

১৯১৫ সালের আগস্টেও সুভাষ মনে করতেন তার জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে এবং এ জন্যই তার জন্ম হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা (দুর্ঘটনা!) তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ঘটনার নায়ক এডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন (Edward Farley Oaten)। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে কুৎসিত ও দুর্গন্ধময় যে অধ্যায়টা আছে তার সার্থক মূর্ত রূপ হল এই ওটেন সাহেব। ঘটনার প্রতি-নায়ক সুভাষ। ১৯১৬ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে সুভাষের ক্লাসের কিছু ছেলের সঙ্গে বারান্দায় ওটেনের কথা কাটাকাটি হয়। ওটেনের অভিযোগ, ছেলেরা ইচ্ছে করেই বিভিন্ন বিরক্তিকর ব্যবহারের দ্বারা তার ক্লাসের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। সুভাষ তাঁর ক্লাসের ছাত্র-পরামর্শমূলক কমিটির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সমস্যাটি প্রিন্সিপালের কাছে উত্থাপন করে। প্রিন্সিপাল হেনরি আর জেমস্ (Henry R. James) দু'পক্ষকেই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইতোমধ্যে পানি অনেক দূর গড়িয়েছে, ফলে ব্যাপারটি এতো সহজে মীমাংসার মতো ছিল না। ছাত্ররা কলেজে ধর্মঘট ডাকলো। মি. জেমস্ ছাত্রদের ওপর জরিমানা করলেন, ফলে ছাত্ররা ধর্মঘট উঠিয়ে নিল। ওটেন এবং ছাত্রদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছিল বিষয়টির একটি রফাদফা করার জন্য কিন্তু তা হয়নি, পরিস্থিতি তখনও জ্বালাময়ী। ১৫ ফেব্রুয়ারি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এক ছাত্র অভিযোগ করলো ওটেন তাকে ডেকে নিয়ে রাস্কেল বলেছে এবং কানে ঘুষি মেরেছে। ঐ দিন দুপুর তিনটার দিকে ওটেন যখন একটা ক্রিকেট নোটিশ পিন-আপ করার জন্য নিচতলায় আসল, চোখের পলকে কিছু ছাত্র তাকে ঘিরে ধরল এবং উত্তম-মাধ্যম দিয়ে উধাও হয়ে গেল। সরকারি যে কমিটি ঘটনাটি তদন্ত করেছিলেন তাদের মতে ওটেন 'নির্দয়ভাবে প্রহৃত' হয়েছিলেন। পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল এক মিনিটেরও কম সময়ে।

সম্ভবত ওটেনকে পিটানোর পরিকল্পনা এবং কাজটা পরিচালনা দু'টোই সুভাষ করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, সুভাষ সশরীরে সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না। এবং যদি সশরীরে অংশগ্রহণ করে থাকেন তাহলে যারা ওটেনের গায়ে হাত তুলেছিল সে তাদের মধ্যে একজন কি না। সুভাষ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন 'আই উইটনেস' মাত্র। পরবর্তীতে সুভাষের নাতি অমিয় তাকে প্রশ্ন করেছিল- সে সত্যি সত্যি ওটেনকে পিটিয়েছিল কি না। উত্তরে সুভাষ একটি রহস্যময় হাসি হেসেছিল। কলেজের বেয়ারা বংশীলাল সুভাষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, এর ফলে ব্যক্তিগতভাবে জেমসের কোনো সন্দেহই ছিল না যে সুভাষ ঘটনার সাথে জড়িত। বংশীলাল বলে সে নিজ চক্ষে ঘটনা ঘটতে দেখেছে এবং তখন সে জেমসের রুমে একটি ছোট্ট পর্দার পেছনে টুলে বসেছিল। সুভাষ যখন হেঁটে যায়, বংশীলাল তাকে চিনে ফেলে। জেমস্ বলেছিল 'বসু, তুমি কলেজের সবচে ঝামেলার ছেলে। আমি তোমাকে বহিস্কার করলাম।' কলেজের গভর্নিং বডিও এই বহিষ্কার-আদেশ সাথে সাথে মঞ্জুর করেছিল।

সুভাষ যেন আর কোনো কলেজেই পড়াশোনা করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হলো। শরৎ (সুভাষের মেজদা) ভাবলেন কোলকাতা সুভাষের জন্য নিরাপদ নয়। তাই তিনি তাকে কটকে পাঠিয়ে দিলেন। ওরিয়া বাজারে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে তার সময় কাটছিল। এদিকে চেষ্টা চলছিল যেন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাকে কলেজে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। এক বছর পর কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল। সে চিন্তা করল স্কটিস চার্চ কলেজে ভর্তি হবে। কলেজের প্রিন্সিপাল ড. উরকোহার্টকে (Dr. Urquhart) তার কাছে একজন পছন্দসই মানুষ বলে মনে হল। প্রিন্সিপালও সুভাষকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে সুভাষ তার পড়াশোনা পুনরায় শুরু করেন।

এ সময় সুভাষ ৪৯তম বেঙ্গলীতে যোগদানের আবেদন করেন। কিন্তু চোখ পরীক্ষায় বাদ পড়েন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক ইউনিটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বেলঘরিয়ার সামরিক ক্যাম্পে ট্রেনিং-এর সময় সামরিক পোশাকে তোলা সুভাষের একটি পরিচিত ছবি আছ।

১৯১৯ সালের এপ্রিলে সুভাষ চূড়ান্ত গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, এ ব্যাপারে তাকে সার্বক্ষণিক সাহায্য করেছে বন্ধু ভোলানাথ রায়। তার প্রিয় বিষয় 'দর্শনের ইতিহাস' এবং 'রচনায়' খুব ভালো করেছিল কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সে খুব একটা ভালো করতে পারেনি। এ জন্য তার ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াটা মিস হয়ে যায়। সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রেজাল্ট বের হতে না হতেই মেজদা শরৎ এসে উপস্থিত। বাবা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুভাষকে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। জানকীনাথের ছেলেদের জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া, পড়াশোনা করা নতুন কিছু নয়। ইতোমধ্যে শরৎ ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছে। বড় ভাই সতীশ তখনো লন্ডনের বেলসিজ পার্কে ব্যারিস্টারির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুভাষকে সরাসরি প্রস্তাব দেওয়া হল ব্রিটিশ রাজকে সেবা করার জন্য এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হল চব্বিশ ঘণ্টা। সুভাষ পড়ল এক মারাত্মক মানসিক দ্বন্দ্বে। ব্রিটিশ রাজত্বে আইসিএস (ICS) ছিল সবচেয়ে কঠিন এবং সম্মানজনক পরীক্ষা। মেধাবীদের লক্ষ্য থাকত এই পরীক্ষার দিকে। আইসিএস পরীক্ষায় পাস করা মানে স্বর্গের পথ প্রায় অতিক্রম করা। সুভাষ কখনো চিন্তা করেনি যে তাকে ব্রিটিশদের সেবা করতে

হবে। যেহেতু বাবার স্বপ্ন, অতএব পূর্বের সব পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত। অবশেষে সে বিলাত যেতে রাজি হল।

৩.

পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল, কারণ পুলিশ তার সম্পর্কে জানত। কিন্তু ওপর তলায় যোগাযোগ থাকার কারণে এই সমস্যা থেকে পার পাওয়া গিয়েছিল। ১৯১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সে SS The City of Calcutta যোগে কিদ্দেরপুর ঘাট থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়। নভেম্বরের প্রথম দিকে সুভাষ সেখানে মোটামুটি স্থায়িত্ব লাভ করে। বিলাত যাওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে সে বন্ধু হেমন্ত'র কাছে বিলেতীদের উন্নত মন-মানসিকতা, সুন্দর আচরণ, কঠোর পরিশ্রম করার যোগ্যতা ইত্যাদি জানিয়ে চিঠি দেয়। সুভাষ ইংরেজদের এমন মহান জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে যে গুণগুলো কাজ করেছে সেগুলোর মধ্যে তাদের মারাত্মক সময়জ্ঞান, আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মজবুত কমনসেন্সের প্রশংসা করেছে। তার মন্তব্য, 'তাদের অনেক ত্রুটি আছে ঠিকই। কিন্তু অনেক ব্যাপারে তাদের গুণকে শ্রদ্ধা করতে হবে।'

ছোটখাটো বিষয়ে সুভাষ খুব আনন্দ পেত। সে তো খুবই খুশি যখন দেখল এখানে ছাত্রদের পেছনে পুলিশ লেগে থাকে না। কেমব্রিজ বুকশপ থেকে সে ঋণ করে বই কিনতে পারে এবং সেখানে বিতর্ক চর্চার ব্যাপক সুযোগ। কিন্তু সে ভুলতে পারেনি যে ইংরেজরা তার দেশের প্রভু। সে পড়েছে এক অন্তর্দ্বন্দ্বে। সে তাদের এখানে পড়াশোনা করতে এসেছে যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজ ভূমিকে মুক্ত করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই মানসিক টানাপড়েনকে আমেরিকান পন্ডিত লিওনার্ড গর্ডন আখ্যায়িত করেছেন 'Good boy, bad boy' সিনড্রোম বলে। তাকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে, আবার তাদেরকে জয়ও করতে হবে। তাকে বিদ্রোহ করতে হবে পিতৃ-মাতৃসুলভ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, তথাকথিত 'ভদ্রলোক' সমাজের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, এমনকি গান্ধীর ধীরে চল ও আপোষমূলক নীতির বিরুদ্ধে।

১৯২০ সালের জুলাইয়ে সুভাষ আইসিএস পরীক্ষায় বসল। পরীক্ষার জন্য তার নয়টি বিষয় ছিল। এর মধ্যে একটি বিষয় সে ভীষণ উপভোগ করেছিল। সেটি হলো আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস। এ বিষয়ে পড়াশোনার আগে অধিকাংশ ভারতীয়র মতোই তারও ধারণা ছিল ইউরোপ মানেই ইংল্যান্ডের উন্নত সংস্করণ। ইউরোপের ইতিহাস পড়তে গিয়ে তার এই ভুল ভেঙে যায়। আইসিএস পরীক্ষার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তারপরও তার সন্দেহ ছিল ভালো করতে পারবে কি না। পরীক্ষার পর মা-বাবাকে সবচেয়ে খারাপ কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে আগেভাগেই বলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটল উল্টোটা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যখন রেজাল্ট প্রকাশিত হলো তখন নিজেকে অবাক করে দিয়ে সুভাষ চতুর্থ স্থান অধিকার করে বসল। ইংলিশ কম্পোজিশনে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল যুগ্মভাবে। অন্যজন ছিল

†bZvRxi ¯¿x Gwgwj †kDKj Ges †g‡q AwbZv →

†bZvRxi †g‡q AwbZv ↓

রামলিঙ্গম। রামলিঙ্গম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। সর্বোচ্চ ৬০০০ নম্বরের মধ্যে সুভাষ পেয়েছিল ২২৮৪ নম্বর। রামলিঙ্গম পেয়েছিল ২৬৯৫। পরীক্ষার মেধাতালিকার প্রথম সাতজনের মধ্যে ছয় জনই ছিল ভারতীয়। এতবড় সম্মানের পরীক্ষায় এত ভাল রেজাল্ট করার পর এখন সুভাষের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। কী হবে সে- বিদ্রোহী নাকি আত্মসমর্পণ করে তথাকথিত চাকরিজীবী ভদ্রলোক।

সুভাষ সিদ্ধান্ত নেন চাকরি না করার। ছেলের এই সিদ্ধান্তে বাবা জানকীনাথ তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁর সাতমাস সময় লেগেছিল এই ধকল কাটিয়ে উঠতে। ১৯২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সে কেন বিদেশী সিভিল সার্ভিসে চাকরি করবে না- এই মর্মে মেজদা শরতের কাছে একটি চিঠি লিখে। সুভাষ স্বীকার করে এই চাকরি পার্থিব সকল সুযোগ-সুবিধাই এনে দেবে সত্য, কিন্তু সেটা আরেকজনের আত্মার বিনিময়ে। সে লিখেছে, 'আমি বিয়ে করছি না- অতএব পার্থিব কোনো বৈভবই আমাকে নির্দিষ্ট কোনো উদ্যোগে দমিয়ে রাখতে পারবে না, যদি আমি বিশ্বাস করি যে আমি যা করতে যাচ্ছি তা সত্য।'

জানকীনাথ ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন: চাকরি নাও। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিও। কিন্তু পিতার মনোঃকষ্ট উপলব্ধি করেও নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন সুভাষ।

জানুয়ারির মাঝামাঝি হঠাৎ করে সে একজন ব্যক্তির সন্ধান পেল, যিনি তার চিন্তাতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন : চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি ছিলেন কোলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী। অগণিত টাকা রোজগার করতেন। কিন্তু 'রাওলাট আইন'-এর বিরুদ্ধে গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর আইন ব্যবসা ও মিহি- নরম পশ্চিমা কাপড় ত্যাগ করলেন। গান্ধীর বিখ্যাত খাদি পরে তিনি বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। এ রকম একটি উদাহরণই সুভাষ খুঁজছিল। সে শরৎ-এর কাছে লিখল, সি. আর. দাসের মত একজন লোক যদি এই বয়সে এসে জীবনের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে- তাহলে, আমার মত এক জোয়ানেরও পারা উচিত, আমি তো এখনও কোনো গুরুতর কোনো সাংসারিক দায়িত্বে নিয়োজিত হইনি।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১, সুভাষ সি.আর. দাসকে একটি চিঠি লিখে। চিঠিতে আবেদন করে দেশের জন্য সে যেকোনো কিছু করতে রাজি, প্রয়োজনে দেশীয় পত্রিকায় সাংবাদিকতা করবে অথবা গ্রাম্য কর্মী হবে বা কোনো স্কুলে যোগদান করবে। চিঠিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য এ বিষয়ে সুভাষ তাঁর নিজের মতামত দেয়। সি.আর দাস এই ছেলের প্রতিভার ধার টের পেয়ে আর দেরি করেননি- সাথে সাথে সুভাষকে গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালের ২২ এপ্রিল সুভাষ এডউইন মন্টেগুকে (তখনকার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া) চিঠিতে চূড়ান্তভাবে জানায় যে তার পক্ষে ব্রিটিশ রাজের সেবা করা সম্ভব নয়- অতএব চাকরির তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রাজপক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এই জিনিসকে হারানো যাবে না। তারা সুভাষের ভাই সতীশকে কেমব্রিজে পাঠাল সে যেন তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করে; কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। আট মাস সময় লাগল কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত এটাই যে, সুভাষ চাকরি করছে না।

জুন মাসে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দিলীপের কাছ থেকে ৯০ ডলার ধার করে সে ভারতের উদ্দেশে রওনা হল। সুভাষ যে জাহাজে দেশে ফিরছিল সেই জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন। তাঁরা দু'জনে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলেন।

দেশে ফিরে তার সামনে দুটো প্রস্তাব ছিল-

এক. রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়া, দুই. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া। কিন্তু কোনোটাই পারেনি।

৪.

ধীরে ধীরে সুভাষের রাজনীতির মাঠে প্রবেশের প্রস্তুতি চলছিল। এই প্রস্তুতি পর্বকে ত্বরান্বিত করে একটি দুর্ঘটনা। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি চরম দুর্দিন-কাল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড।

১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাশ হয়। এতে প্রাদেশিক নির্বাচন ও স্থানীয় শাসনের কথা বলা হলেও মৌলিক কোনো পরিবর্তন ছিল না। বরং রাজশক্তি সশস্ত্র বিপ্লবীদের দমনের জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীণ একটি আইন জারি রাখে। 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' নামে আইনটির নতুন নামকরণ হয় 'রাওলাট আইন'। এর আওতায় বাকস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ও বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের বিধান রাখা হয়।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯১৯ সালের এপ্রিলে রাজশক্তি ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেল। ভারতের অপরাপর স্থানের মত পাঞ্জাবের অমৃতসরেও অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল পুরোদমে। তারপরও পাঞ্জাব সরকারের নির্দেশে মাইল্‌স্ আরভিং (Miles Irving-ডেপুটি কমিশনার) পাঞ্জাবের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'জন নেতাকে সরিয়ে দিলেন। ফলে ঐ অঞ্চলের অহিংস আন্দোলন হিংসাত্মক আন্দোলনে মোড় নিল। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরকে জুলন্দর ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিডিনাল্ড ডায়ারের কাছে হস্তান্তর করা হলো। কিছু সময়ের মধ্যেই ডায়ার এলাকায় সামরিক আইন জারি করল। সামরিক আইন জারির খবর যখন শহরের চারপাশে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হচ্ছিল, তখনই ডায়ার খবর পেল জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হলো একটি বড় খোলা জায়গা কিন্তু একটি মাত্র প্রবেশপথ- তাও আবার খুবই চিকন। ডায়ার দেখল সেখানে ২০ হাজারের মতো নারী-পুরুষ-শিশু বক্তৃতা শুনছে। সমাবেশটি পুরোপুরি রাজনৈতিক ছিল না। কারণ ১৩ এপ্রিল ছিল পহেলা বৈশাখ, বছরের প্রথম দিন হিসেবে এটি ছিল একটি উৎসবের আয়োজন। তাছাড়া সেখানে কোনো সশস্ত্র ব্যক্তি ছিল না। ডায়ার দেখল, প্রবেশপথ এত ছোট যে তার কামান এই দরজা দিয়ে ঢুকবে না। সে তার সৈন্যবাহিনীকে প্রবেশপথ ঘেরাও করতে নির্দেশ দিল এবং কোনো সতর্কবানী ছাড়াই গুলি চালাল নিরস্ত্র নারী-পুরুষ-শিশুদের ওপর। ৩৩৭ জন পুরুষ, ৪১ জন মহিলা ও সাত সপ্তাহের একটি শিশুকে মারার পর তার সৈনিকদের গুলি ফুরিয়ে যায়, (পরবর্তীতে কংগ্রেসের অনুসন্ধানে জানা যায় ১০০০-এর চেয়েও বেশি লোক মারা গিয়েছিল)।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আমূল পাল্টে দেয়। এরপর আন্দোলন-সংগ্রামের বিষয়ে আর কারো (গান্ধী, মতিলাল, জওহরলাল, সিআর দাস এবং অন্যান্য) পেছনে ফেরার অবকাশ ছিল না। এমনি এক প্রেক্ষাপটে সুভাষ ভারতের রাজনৈতিক মাঠে আবির্ভূত হন।

১৯২১ সালের ১৬ জুলাই সুভাষের জাহাজ বোম্বে বন্দরে পৌছয়। ঐদিন বিকালেই সে বোম্বের চৌপট্টিতে গান্ধীর সদরদপ্তর মনি ভবনে আসে। সে মারাত্মক বিব্রতবোধ করছিল। কেননা দেশী খাদি পরিহিত সব লোকের মধ্যে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে ওয়েস্টার্ন স্যুট গায়ে জড়ানো। ভেতরে বিপ্লবের দগদগে আগুন, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের পদ্ধতি ও কৌশল এবং এ বিষয়ক আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর তাকে ভেতরে ভেতরে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

গান্ধী তাঁর সহজসাধ্য ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে তাঁর অভিযান শেষ পর্যন্ত কর অনাদায় (Non-payment of taxes) আন্দোলনে পরিণত হবে। কিন্তু সুভাষ ভারত কীভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করবে এ বিষয়ক গান্ধীধর্মী উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তিনি আশা করেছিলেন গান্ধী তার বর্জন আন্দোলনকে এমন একটি পরিকল্পনামাফিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিচালনা করবেন যার ফলে বৃটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার ওপর চাপ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু গান্ধী অন্তরাত্মার পরিবর্তন বলে কিছুতে বিশ্বাস করতেন। সেখান থেকে সুভাষ কলকাতা ফিরে যায়।

GB †mB Mwo, GB Mwo‡ZB †bZvRx Mfxi iv‡Z cwj‡q wM‡qwQ‡j b GjwMb †iv‡Wi ewo †_‡K| mió n‡qwQj i"×kvm GK bZb BwZnvm

গান্ধীর পদ্ধতি সুভাষের সাথে খুব বেশি একটা মিলত না। সুভাষ গান্ধীকে 'গান্ধীজি' বা 'মহাত্মাজি' বলে সম্বোধন করতেন, কখনো 'বাপুজি' বলতেন না। 'বাপুজী' সম্বোধনটা গান্ধীর অনুসরণকারীদের জন্য প্রায় ব্যধ্যতামূলক ছিল। এই সম্বোধনের জনপ্রিয়তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান হলো জওহরলাল নেহরুর। 'বাপুজি' স্থানীয় সম্মানের জায়গাটি সুভাষ খালি রেখেছিলেন অন্য একজনের জন্য, তিনি সিআর দাস। সুভাষের রাজনৈতিক গুরু।

হেমন্ত তখন সিআর দাসের পুরোদস্তুর ব্যক্তিগত সহকারী। কোলকাতায় ৩৮/২ এলগিন রোডে সুভাষ যখন ফিরে এল হেমন্ত তাকে নিয়ে গেল সি আর দাসের বাড়িতে। তার প্রথম পরিচয় ঘটে দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সাথে। দাসের সাথে যখন তার দেখা হল প্রথম দেখাতেই সে ছিল অভিভূত। সে এতদিন এমন এক জনকেই খুঁজছিল। সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যে দাস সুভাষকে তার প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি নিয়োগ করলেন। সুভাষের ওপর আরো দায়িত্ব পড়ল বৃটিশ রাজের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধী একটি জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। এ রকম কিছু একটা কাজের জন্যই সুভাষ অধীর আগ্রহী ছিল এবং সে খুব আগ্রহের সাথেই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করল। ক্লাসের ব্যাপারে সে তার নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি এবং স্কটিশ চার্চ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। কোর্স পরিকল্পনা, সময়সূচি নির্ধারণ সবই সে পরিকল্পিত উপায়ে প্রণয়ন করেছিল। সে নিজে দর্শনের কিছু ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা রেখেছিল এবং লেকচারের উৎকর্ষের জন্য বিস্তারিত গাইড লাইন প্রণয়ন করেছিল। বেঞ্চ, চেয়ার থেকে ক্লাসরুমের টেবিল সবই সুভাষ নিজে ব্যবস্থা করেছিল। কলেজের হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো। জীবন, মন-প্রাণ সবই সে সঁপে দিয়েছিল ঐ কাজে।

১৯২১ সালের ১৭ নবেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতে আসেন। কংগ্রেস তার আগমনকে প্রতিহত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। গান্ধী এদিন সম্পূর্ণ হরতালের ডাক দেন। কোলকাতায় সুভাষ সি আর দাসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি একটি সফল হরতাল পালন করেন। কোলকাতাজুড়ে সেদিন যেন ছুটির দিন ছিল। সরকার কংগ্রেস এবং এর অঙ্গ সংঘঠনগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল, মিছিল, সভা-সমাবেশও ছিল নিষিদ্ধ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সি আর দাস আন্দোলনের নতুন কৌশল নির্ধারণ করলেন। কংগ্রেস সদস্যরা দলে দলে রাস্তায় যাবে, খাদি বিক্রি করবে এবং যদি গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে কোনো প্রতিবাদ করবে না। যদি এই পরিকল্পনা কাজে দেয় তাহলে জেলখানা মানুষে ভরে যাবে। ফলে সরকার অকার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করছে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দাসকে সে রিপোর্ট দিত। দাস জিজ্ঞাসা করত, 'সুভাষ, কতজন গ্রেপ্তার

হয়েছে?' তার উত্তর 'এখনো কেউ না স্যার।' দাস সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে তার ছেলেকে, পরে তার স্ত্রীকে এবং সবশেষে তার বোন উর্মিলাকে জেলে পাঠাবে। এহেন সিদ্ধান্তে সুভাষ আতঙ্কিত। বাসন্তী দেবীর স্থান তার জন্মধাত্রী মায়ের পরেই। বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তিনি মুক্তি পেয়ে ঘরে ফেরার পরও সুভাষ নিজেকে শান্ত করতে পারেনি। বাসন্তী দেবী স্মৃতিচারণ করছেন, 'রাগে তার মুখ কাল হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সুভাষ তখনো রাগ সামলাতে পারেনি। আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখন তো সব ঠিক আছে। আমি ফিরে এসেছি, এখন শান্ত হও।' সে ধীরে ধীরে শান্ত হল এবং অঝোরে কান্না শুরু করে দিল।

তিন দিন পর সরকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার সিদ্ধান্ত নিল। দাস এবং তার বেশির ভাগ সহযোগীকেই গ্রেপ্তার করা হল। সুভাষকেও খোঁজা হয়েছিল। সন্ধ্যায় সে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারকে ফোন করল- 'শুনেছি, আপনি আমাকে খুঁজেছিলেন? আপনি কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চাচ্ছেন? আমি এখন প্রস্তুত।' সাথে সাথে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। কোলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ছয় মাসের কারাদন্ড প্রদান করলেন। ছয় মাসের জেল হওয়ার পর সুভাষের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'মাত্র ছয় মাস? আমি কি মুরগি চোর নাকি?'

বৃটিশদের কারাগারে সুভাষের এগারবার জেল জীবনের এটা ছিল প্রথম বার। প্রথম দিকে জেলে সে আনন্দমুখর সময় কাটিয়েছে। এর কারণও আছে। ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাতে কোনো বাধা ছিল না। দাসের পাশের সেলেই তাকে রাখা হয়েছিল। দাসের জন্য রান্নাবান্নার দায়িত্ব তার। বাসন্তী দেবী প্রতিদিন আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে আসতেন। বাজার-সদাই তিনিই করে দিতেন। এই প্রথম জেলে সে গুরুর খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। সে অবাক হয়ে গিয়েছিল সি আর দাসের বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সাহিত্যের জ্ঞান দেখে।

জেলে বসেই সুভাষ খবর পায় গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। কারণ, চৌরি চৌরা গ্রামের দুর্ঘটনা। চৌরি চৌরা যুক্ত প্রদেশের একটি গ্রাম। সেখানে কিছু বিক্ষুব্ধ জনতা একটি থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কয়েকজন পুলিশ মারা যায়। আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য গান্ধীর সরকারি ব্যাখ্যা ছিল এ রকম যে, সাধারণ মানুষ এখনো অহিংস ধরনের আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি। তাই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। কিন্তু সুভাষের মন্তব্য হল এভাবে হুট করে আন্দোলনের মাঝখানে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া গান্ধীবাদের ব্যর্থতা প্রদর্শনের একটি উপায় ছাড়া আর কিছু নয়।

গান্ধীজির বিরোধিতা করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন কোনো বিকল্প সংগঠন। এই কাজের দায়িত্বও চাপল সুভাষের উপর। প্রচার সম্পাদকের পাশাপাশি তাকে একটি যুব আন্দোলন ও একটি শ্রমিক সংগঠনের

mvBMb wegvbe›`‡i †Zvjv †bZvRxi †kl Qvie| †K RvbZ Gici N‡U hv‡e Ggb wKQ, hvi inm¨ †KD Rvb‡e bv, †Kv‡bv`b bv...

প্রস্তুতির কাজ করতে হয়েছিল। সে জেল থেকে ছাড়া পায় ১৯২২ সালের ৪ আগস্ট। এর দুদিন পরই সে যুবকদেরকে নিয়ে একটি সম্মেলন করে এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতেই অনুষ্ঠিতব্য নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনের কাজ অনেকটাই এগিয়ে যায়। সেখানে সে স্পষ্ট ভাষায় দারুণ কার্যকরী একটি ভাষণ প্রদান করে এবং সম্মেলনে অস্পৃষ্য প্রথা, যৌতুক প্রথা উচ্ছেদ ও বাল্য বিবাহ নিরোধ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর সপ্তাহখানেকের মধ্যে বাংলাদেশের চারটি জেলা মারাত্মকভাবে বন্যাকবলিত হয়। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কংগ্রেস সুভাষকে সেখানে পাঠায়। নেই পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, স্বেচ্ছাসেবকও স্বল্প- তবুও সুভাষের বিরাম নেই। জানকীনাথ এলেন ছেলেকে দেখতে। সামনে দুর্গা পূজা। সুভাষ বাবার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, 'বাবা তুমি ঘরে ফিরে দুর্গাপূজা করো। আমি এইসব হতভাগ্য মানুষের সঙ্গেই মা দুর্গার পূজা করব।'

কংগ্রেস রাজের উপর গোস্বা করে কাউন্সিলে কোনো আসন গ্রহণ করেনি। কিন্তু দাস টের পেয়েছিলেন এতে করে ক্ষতিটা কংগ্রেসেরই বেশি হবে। তাই তিনি কাউন্সিলে যোগদান করার প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাব প্রশ্নে ভোটাভুটিতে দাস শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন। সাথে সাথে তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মতিলাল নেহরু ও সমমনা আরো কয়েকজনকে নিয়ে স্বরাজ দল গঠন করেন।

এ সময় দাস দুটি পত্রিকা বের করেন। 'বাংলার কথা'র সম্পাদক হন সুভাষ। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে সুভাষ বলেন, অবশ্যই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বস্তুগত সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করবে, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন গান্ধীবাদী স্বরাজ এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ১৯২৪ সালের কোলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে সি আর দাস বিপুল ভোটে পাস করলেন। শরৎ ও সুভাষ দুই ভাই-ই কর্পোরেশন ভোটে জিতল। স্বরাজ দল দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করল। দাস মেয়র নির্বাচিত হলেন এবং সুভাষ তার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার।

সাতাশ বছর বয়সে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের দায়িত্ব সুভাষের কাঁধে। তার মাসিক বেতন ছিল ৩ হাজার রুপি। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিল বেতনের অর্ধেক নিবে, অর্থাৎ ১৫০০ রুপি। তার ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি ছিল। ধীরে ধীরে সে কর্পোরেশনের প্রেমে পড়ে গেল।

শীঘ্রই সুভাষ সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প তৈরি হতে লাগল। একবার চিফ ইঞ্জিনিয়ার কোটস এলেন সুভাষের সাথে দেখা করতে এবং তার সামনেই কোটস সিগারেট ফুঁকতে শুরু করলেন। সুভাষ মুচকি হাসি দিয়ে ভদ্রতার সাথে প্রশ্ন করল, 'কোটস সাহেব, উর্ধ্বতন কর্তার সামনে কি ধুমপান করাটা ঠিক?' কোটস সাথে সাথে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সিগারেটটি অ্যাশট্রেতে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলে দিলেন।

ইতোমধ্যে তার পেছনে পুলিশের গুপ্তচর লেগে যায়। একজন এজেন্ট প্রতিদিন তার কর্মকান্ডের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করছে। সরকার সন্দেহ করা শুরু করল যে, সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাথে সুভাষের যোগাযোগ আছে।

৫.

এদিকে সুভাষের রাজনৈতিক কর্মকান্ড এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ৩৮/২ এলগিন রোডের বাসার জায়গা আর হচ্ছিল না। শরৎ ৩৮/১ নম্বর বাসাটি ভাড়া নেওয়ার পর এটিই তার থাকার নতুন ঠিকানা। ১৯২৭ সালে শরৎ উডবান পার্কে একটি বাড়ি তৈরি করে। ইতোমধ্যে সে একজন নামকরা সফল ব্যারিস্টার। এরপর থেকে সুভাষ যখনি জেলের বাইরে থাকত বা ভারতে থাকত ঐ তিন তলা বাড়ির উপরতলা ছিল তার জন্য নির্দিষ্ট।

মাঝে মাঝে সুভাষদের এলগিন রোডের দুটি বাড়িই লোকে উপচে পড়ত। সারা দেশ হতে বিভিন্ন অতিথি আসত, তাদের থাকা-খাওয়া-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হত। সারা দিনই রাজনৈতিক কর্মীদের স্রোত লেগেই থাকত।

১৯৩০-এর দশকে নীরদ চৌধুরী উডবান পার্কের বাড়িতে শরৎ-এর সেক্রেটারি হিসেবে ছিলেন। সুভাষও সেখানেই থাকত। একদিন সকালে তাদের বাড়িতে গিয়ে নীরদ চৌধুরী দেখল সামনের দরজার কাছেই একটি বড় বোর্ড ঝুলানো আছে। কালো রঙের ওপর বড় সাদা অক্ষরে লেখা- দর্শনার্থীরা তার সাথে দেখা করতে পারুক বা না পারুক সে সব সময়ই

তাদের সেবায় ব্যস্ত আছে।

১৯২৪ সাল হলো সুভাষের রাজনৈতিক জীবনের শুরুর কাল। এ সময়ে সে প্রাণশক্তিতে ভরপুর একজন দক্ষ যুবক। লম্বা-চওড়া, সুগঠিত দেহের অধিকারী, ওজন (সাধারণত) ৮৩ কেজি (১৮২ পাউন্ড), মঙ্গোলিয়ান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আকর্ষণীয় গড়নের কারণে সবার কাছেই ছিলেন আকর্ষণীয়। বিয়েশাদির প্রস্তাব প্রায়ই আসতো। একবার এক ধনকুবের বাঙালি সুভাষের বাবাকে প্রস্তাব দিলেন তিনি তার মেয়েকে সুভাষের হাতে তুলে দিতে চান। সুভাষ এমন প্রস্তাব ক্ষোভের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অবশ্য বিয়ে করবে না এমন আনুষ্ঠানিক প্রচার সে কখনোই করেনি। ইংল্যান্ড থেকে চিঠিতে সে শরৎকে জানিয়েছিল যে বিয়েশাদি যেহেতু করবো না, অতএব আইসিএস ত্যাগ করলেও কিছু হবে না। কিন্তু বাসন্তী দেবী দৃঢ়ভাবে বলেন যে, সুভাষ বিয়ে করবে না এমন কথা কখনো বলেনি। তবে এটুকু বলা যায়, যতদিন সে ভারতে ছিল ততদিন বিয়ে করার বিষয়টি বিবেচনায় আনেনি। টাকা-পয়সা এর পেছনে একটি কারণ হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই সে ভাই শরতের ওপর নির্ভরশীর ছিল। একটি বিশাল যৌথ পরিবারে বসবাস করাটাও বিয়েশাদির ব্যাপারে তার মনোযোগ না দেয়ার একটি কারণ হতে পারে। এ ছাড়াও যৌন জীবন সম্পর্কে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারাও মেয়েদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সুভাষের সম্পর্কটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। সিআর দাসের সচিব হিসেবে যোগ দেয়ার পরই মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তার চমৎকার একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্ক পরবর্তীতে এতোই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে সুভাষ মনে করতো বাসন্তী দেবীও তার মা। আর বাসন্তী দেবীকে সুভাষের মা বলেছিলেন, 'আমি সুভাষকে জন্ম দিয়েছি সত্য, কিন্তু তার প্রকৃত মা আপনি।'

নিজে বিয়েশাদির চিন্তা না করলেও অন্যের বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়াটা সুভাষের জন্য ছিল বাধ্যতামূলক। একবার সে কথা দিল একটি বিয়েতে যাবে। হাওড়ায় একটি রাজনৈতিক সমাবেশ থাকার কারণে সে বিয়েতে যোগ দিতে পারেনি। সব কাজকর্ম সেরে যখন সে কিছুটা অবসর পেল, তখন সকাল হতে কিছুক্ষণ বাকি। সঙ্গে বিশ্বস্ত সহযোগী সত্য বকশি। বকশির ইচ্ছা এখন বাড়ি গিয়ে একটা আরামের ঘুম দেবে। কিন্তু সুভাষ জোরাজুরি করতে লাগলো, কারণ সে কথা দিয়েছে বিয়েতে যাবে। অতএব যেতে হবে। রাত দুটোর সময় তারা কনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। ঘুমন্ত পুরো পরিবারকে জাগানো হলো। সুভাষ দুঃখ প্রকাশ করলো এতো রাতে বিরক্ত করার জন্য। এরপর সে বিয়ের খাবার দাবি করল। বিয়ের খাবার কী আর তখন থাকে? বিস্ময়ভরা সেই পরিবারও যেন যাদু দিয়ে কিছু মিষ্টি ও চায়ের ব্যবস্থা করল।

চা ছিল তার সার্বক্ষণিক পানীয়। খুবই-খুবই কর্মব্যস্ত দিনেও সে বিশ কাপের মতো চা খেত। অনেক বছর পরে সে হরি ভিষ্ণু কমথকে বলেছিল চা ছাড়া কোনো রাজনীতি হতে পারে না। যুদ্ধ মুহূর্তে বার্লিনে থাকার সময়ে যে লিকার খেতেন এত কড়া লিকার সে খেত না। খাবারের ব্যাপারে সে খুব একটা বাচ বিচার করত না। সে রান্না করতে এবং খেতে ভালো বাসত। পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) সফরের সময় সে এবং তার সাথীরা একটি বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হল : সমস্যাটি হল এই অঞ্চলের যারা রাজনীতিবিদ তাঁরা সবাই সুভাষকে মেহমান দাবি করতে চায়- অন্তত একবেলা তাকে খাইয়ে ছাড়বে। এতো এক অসম্ভব পরিস্থিতি! সবার বাড়িতে কীভাবে খাওয়া সম্ভব? শেষ মেশ সুভাষ একটা প্ল্যান বের করল : সব গৃহিণীই আলাদা আলাদা একটি করে তরকারি রান্না করবেন এবং সুভাষ তা চেখে দেখবেন।

সস্তা হাস্য-রস, তামাশা, রসিকতার অভ্যাস তার মধ্যে ছিল না। ১৯৪৩ সালে জার্মানি থেকে জাপান যাওয়ার জন্য ৯৩ দিনের সাবমেরিন যাত্রার সময় সুভাষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিল। এমনকি বিভিন্ন কূটনৈতিক পদ বন্টনের ব্যাপারেও সে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিল। সাবমেরিনের ভেতরে প্রতিটি মুহূর্তেই এমন টান টান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটছিল। এক সময় সে তার সফরসঙ্গী আবিদ হাসানের কাছে এসে প্রশ্ন করল স্বাধীন ভারতে সে কেমন চাকরি চায়। আবিদ একটা দুষ্টামিপূর্ণ হাসি হেসে বলল, 'আমাকে কি দয়া করে হুডুরাসের মিনিস্টার করে পাঠাবেন?'

সুভাষ তো হতভম্ব, প্রশ্ন করল ' কেন?'

আবিদ উত্তর দিল, দেখুন স্যার, আপনি যখন ভারতে পৌঁছবেন তখন সবাই চাকরির জন্য আপনার কাছে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে আমি সেই দৌড়ে টিকতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আমি এমন কিছুই চাইব যা অন্য খুব কম লোকই আপনার কাছে চাইবে'।

যুদ্ধকালীন সময়ে জার্মানিতে সুভাষের একবার প্রচন্ড মাথা ব্যথা শুরু হলে সে একজনকে বলল একটা কৌতুক শুনাতে। কেউ একজন একটা কৌতুক বলেছিল। কৌতুকটা ছিল এরকম- এক লোক দুই রঙের দুটো মোজা পরে বাইরে বের হয়েছে; তা দেখে অনেকেই হাসাহাসি করছে। কেউ যদি বলছে 'কী ব্যাপার দুই রঙের দুই মোজা পড়েছেন কেন?' তার সরল উত্তর, 'ঠিক এরকম আরেক জোড়া আমার বাড়িতেও আছে।' সুভাষ নীরবে কৌতুক শুনল এবং প্রশ্ন করল, 'এটা কি জার্মানিতে নতুন ফ্যাশন নাকি?'

তার ভাইয়ের, বোনের ছেলে-মেয়ে সবার কাছে সে ছিল দারুণ জনপ্রিয় মানুষ। সবাই তাকে ডাকত 'রাঙা কাকাবাবু' বলে। পিচ্চি-বাচ্চাদের সঙ্গে সে পলান্তি খেলত। পিচ্চিরা পালাত আর তার কাজ ছিল খুঁজে বের ররা। এলগিন রোডের বিশাল বাড়ির আনাচে কানাচে, সিঁড়িতে সে শিশুদের খুঁজে বের করার জন্য পাগলের মতো ছুটত।

দুর্ভাগ্য সুভাষের। শিশুদের সঙ্গ দেয়ার চেয়ে তাকে বেশি সঙ্গ দিতে হতো জেল খানার চারদেয়ালের কুঠুরিকে। তরুণ সমাজের সাথে সুভাষের ওঠাবসা ও প্রবাব রাজশক্তিকে চিন্তিত করে তোলে। সমাধান ছিল একটাই: জেলে পুরে রাখ সুভাষকে। সব বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতাকেই এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। শুধু সুভাষের বেলায় ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম: সে সাধারণত এমন আইনে গ্রেপ্তার হত যেখানে বিচার করার দরকার নেই। তার জেলের মেয়াদ ছিল অন্য যে কারো চেয়ে বেশি এবং এমন বাজে শর্ত আরোপ করা হতো যেগুলো তার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিন-তিন বার তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অবনতির কারণে। এর মধ্যে একবার মুক্তি দেওয়া হল কারণ তাকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যেতে হবে। আসলে তো স্বাস্থ্যের জন্য ইউরোপ নয়, ব্রিটিশরা ভাবল কোনোভাবে দেশের বাইরে পাঠাতে পারলে দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যেত।

বছরের পর বছর জেলে, জেলে থাকতে থাকতে তার অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে। ১৯২৭ সালের ৭ মে সুভাষকে একটি স্টিমারে তুলে দেওয়া হল আলমোরা পাঠানোর জন্য। কোলকাতা ঢোকার আগ মুহূর্তে ডাক্তার ঘোষণা করলো তার অবস্থা খুব খারাপ। সরকার সিদ্ধান্ত নিল তাকে মুক্তি দেওয়ার। ১৬ মে ১৯২৭ তাকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করা হল।

৬.

দুই বছর ছয় মাস পর সে ৩৮/২ এলগিন রোডের বেডরুমে ফিরে এল। শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং দুর্বল কিন্তু সংকল্পে সুদৃঢ় এবং লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত। মুক্তি পাওয়ার আগে বার্মা ছেড়ে আসার দুদিন আগে সে শরৎকে লিখেছিল, 'আমি দোকানদার নই, দরকষাকষি আমি করি না। তোষামোদী কূটনীতির পথ আমি ঘৃণা করি কারণ এটা আমার নীতিতে বাঁধে'।

সুভাষ জেলে থাকাকালীন সময়েই তার রাজনৈতিক গুরু সি. আর. দাস মারা যান। ঐ সময়ে তার জন্য এর চেয়ে বড় কোনো দুঃসংবাদ ছিল না। গুরুর মৃত্যুর দুঃখে বিমূঢ়, বছরের পর বছর জেল খেটে স্বাস্থ্যের যারপরনাই খারাপ অবস্থা- তার পরও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কোনো বিরাম নেই তার। সি. আর. দাস মারা যাওয়ার পর দলের কর্মীদের মাঝে বিচ্ছিন্নভাব আরো প্রকট হয়েছে। তাঁর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উত্তরসূরিদের বেশির ভাগই ক্ষমতা লাভের কাড়াকাড়িতে লিপ্ত। এদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সবচেয়ে এগিয়ে। তিনি ইতোমধ্যে দাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিয়েছেন, যেমন : স্বরাজ পার্টির সভাপতি, বেঙ্গল কংগ্রেস পার্টির সভাপতি এবং কোলকাতার মেয়র। এর সঙ্গে গান্ধী আরো একটি মুকুট যোগ করলেন- তিনি দাসের গোরসভায় যোগ দিতে এসে সেনগুপ্তকে সি. আর. দাসের উত্তরসূরি হিসেবে সম্মান করলেন। এজন্য শরৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তাহলে সুভাষের জন্য কী রাখলেন?' গান্ধী তাঁর দাঁতহীন মুখে মৃদু হাসি হেসে উত্তর দিলেন, সুভাষের জন্য সারা ভারত রইল (For

Subhas there is the whole of India)।

১৯৩০ সালের শুরুর দিকে বিপ্লবীদের কাজকর্ম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে চট্টগ্রামের ঘটনা পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে ৬২ জন ভারতীয় যুবক চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করে। অবশ্য সুষ্ঠু ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনার অভাবে তারা চট্টগ্রামের সঙ্গে বাইরের টেলিগ্রাফ যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। আর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে বিপ্লবীদের দখলে থাকা শহরটি খুব তাড়াতাড়ি ব্রিটিশরা পুনরুদ্ধার করে ফেলে। ফলাফল যাই হোক না কেন, এই ঘটনা বিপ্লবী কর্মকান্ডে বিশাল এক ঢেউ তোলে। বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় তাদের আক্রমণ আরো জোরদার করে তোলে। ভারতীয় অথবা ব্রিটিশ কোনো পুলিশ অফিসারই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনজন যুবক কোলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ অফিসাররা তাদের ক্ষতি দেখে আতঙ্কিত : ১১ জন নিহত, ১২ জন আহত, এর সঙ্গে ১০ জন নন-অফিসিয়াল নিহত এবং ১৪ জন আহত (অবশ্য বিপ্লবীদের ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়েও বেশি। তাদের ২৬ জন নিহত এবং ৪ জন আহত)।

এসব কর্মকান্ডের জন্য রাজশক্তি সুভাষকে সন্দেহ করত। তাদের ধারণা, সুভাষ জাতীয়তাবাদী দলগুলো পরিচালনা করে এবং বিপ্লবীদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে। আর এসবের পেছনে মূল হোতা হল শরৎ। ১৯৩১ সালের ৭ ডিসেম্বর ডব্লিউ. এস. হসকিন্স (W. S. Hoskyns) দিল্লিতে হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে ৭৫ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৩১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সুভাষের সব কাজকর্ম ও কথাবার্তার তথ্য ছিল। সব দিক বিবেচনা করে রাজশক্তি সিদ্ধান্ত নিল, সুভাষকে আবার গ্রেপ্তার করতে হবে। তবে তাকে বাংলাদেশের বাইরে কোথাও গ্রেপ্তার করতে হবে, কেননা বাংলাদেশে গ্রেপ্তার করলে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে নতুন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ১৯৩১ সালের ২২ ডিসেম্বর ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং বাংলাদেশে সরকারের মধ্যে যৌথ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুভাষের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট তৈরি হয়ে গেল। এখন শুধু অপেক্ষা সে বাংলার বাইরে কখন যাবে। ১৯৩১ সালে সুভাষ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দেওয়ার জন্য বোম্বে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে কোলকাতা ফেরার পথে বোম্বের বাইরে যখন তারা থামল তখন পুলিশ তাকে একটা ওয়ারেন্ট দেখিয়ে ট্রেন থেকে নিয়ে গেল। দুদিন পরে তাকে সেওনি জেলে পাঠানো হল। এটি একটি সাবজেল। ইলেকট্রিসিটিসহ কোনো ধরনের কোনো সুযোগ-সুবিধার বালাই এই জেলে নেই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুভাষ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় শরৎ-এর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে সে মানসিকভাবে আরো ভেঙে পড়ে। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে শরৎকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে সুভাষকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে। এপ্রিলের মাঝামাঝি তার স্বাস্থ্যের অবস্থা এতোটাই খারাপ হয়ে যায় যে, জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট তাকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করতে সুপারিশ করেন। তার কোমরের চারপাশে ব্যথা ছিল এবং হজমে সমস্যা হচ্ছিল। সে কোনোমতে হরলিক্স ও চিকেন স্যুপ খেয়ে বেঁচে ছিল। দিন দিন তার ওজন কমছিল।

চিকিৎসার সুবিধার জন্য কলকাতার চেয়ে ভালো কোনো জায়গা হয় না। কিন্তু বাংলা সরকার এ কথা শুনতেই পারে না। ৩০ মে তাকে জব্বলপুর মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেক চেষ্টা করেও সুভাষের জন্য জেল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ কোনো সরকারই চায় না সুভাষকে গ্রহণ করে তারা জনগণের কোনো তোপের মুখে পড়ে থাক। অবশেষে মাদ্রাজ সরকার তাকে গ্রহণ করতে রাজি হল। ১৬ মে তাকে মাদ্রাজে আনা হয়। সেখানে আরো বেশি মেডিকেল চেকআপ করানো হয়। আগস্টের দিকে ডাক্তাররা বললেন যে, সে যক্ষ্মারোগে ভুগছে। একমাত্র সুইজারল্যান্ডে গেলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

১৯৩৩ সালের ১২ জানুয়ারি ইউরোপ ভ্রমণের জন্য সুভাষের জন্য একটি পাসপোর্ট ইস্যু করা হল। সে যেতে পারবে ফ্রান্স, সুইজাল্যান্ড, ইটালি, অস্ট্রিয়া এবং ডেনমার্ক। জার্মানি এবং গ্রেট ব্রিটেন যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। বিদেশ যাওয়ার আগে সুভাষ মা-বাবার সাথে দেখা করতে চায়। কিন্তু বাংলার সরকার তাকে কটকে যেতে দিবে না। তার মা-বাবাও অসুস্থ ও বৃদ্ধ, ভ্রমণ করতে পারবেন না। শরৎও যেহেতু জেলে, অতএব তার স্ত্রী বিভাবতীকেই সবকিছু সামলাতে হচ্ছিল। সুভাষ ভাবল, বিভাবতীর সাথে ঘন ঘন দেখা হওয়া দরকার। সরকার যদিও তাকে বিদেশে পাঠাতে মরিয়া কিন্তু টাকা দিতে রাজি নয়। ইউরোপে যাওয়ার জন্য ১৫ হাজার টাকার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। কিন্তু সরকার দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ কমিয়ে দিল এবং কড়াকড়ি আরোপ করল যে, সুভাষ এবং তার আত্মীয়দের সাথে কথাবার্তা অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে। ইউরোপে যাওয়ার আগমুহূর্তে জব্বলপুর জেলে সে শরৎ ও কিছু আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিল কিন্তু মা-বাবাকে সে দেখে যেতে পারেনি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ জাহাজে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সে বোম্বে পুলিশের কাস্টডিতে ছিল। তার জাহাজের নাম ছিল SS Gange. জাহাজ যখন ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম করল একমাত্র তখন সে একজন স্বাধীন মানুষ।

ইউরোপে ৪ বছরের মত সে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছে। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। পুরো ইউরোপ চষে বেড়িয়েছে সে। একটার পর একটা বক্তৃতা, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার দিয়েছে, বিভিন্ন সংগঠনের সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছে, বই লিখেছে ইত্যাদি নানা কাজে হরদম ব্যস্ত সে। উদ্দেশ্য একটাই- বিশ্ববাসী জানুক ভারতের উপর অন্যায় করা হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা চাই।

সুভাষের ইউরোপে নির্বাসিত জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল এমিলি শেঙ্কেলের সাথে তার পরিচয় এবং পরিচয় থেকে অবশেষে পরিণয়। তার জীবন ছিল ঝড়ের মতো গতিশীল। ভারতের স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে তাড়া করে ফিরতো সব সময়, সেই সুভাষের একজন বিদেশিনীকে ভালো লেগে গেল

এবং গোপনে বিয়েও করে ফেললেন।

১৯৩৪ সালের জুনের মাঝামাঝি সুভাষ ইউরোপের অনেকগুলো দেশ সফর করে ভিয়েনা ফিরে এলো। ভিয়েনার উচ্চ-মধ্যবিত্তদের এলাকা পিটার জর্ডান স্ট্রসেতে সে একটি ফ্ল্যাট নিল। বাড়িটির সাথে একটি বাগান ছিল, এই ফ্ল্যাটে বসেই The Indian Struggle লেখার জন্য সে মনস্থির করল। কিন্তু শারীরিক অবস্থা খুব একটা সুবিধার না, মাঝে মাঝেই তলপেটে ব্যথা হচ্ছিল, সে জন্য সে শর্ট-ওয়েভ থেরাপি গ্রহণ করত। এই মুহূর্তে তার মনে হল কাজকর্মের সুবিধার জন্য একজন সেক্রেটারি দরকার। মাথুর নামে একজন ভারতীয়কে সে বলল, সেক্রেটারিয়াল কাজকর্ম করবে এমন কেউ তার খোঁজে আছে কি না। মাথুর দু'জন অস্ট্রিয়ান মহিলাকে সুভাষের কাছে পাঠালেন। প্রথম জনকে তার কাছে খুব একটা কাজের মানুষ বলে মনে হয়নি। তাই মাথুর দ্বিতীয় জনকে পাঠালেন। এই দ্বিতীয় জনই এমিলি শেঙ্কেল। তখন এমিলির বয়স চব্বিশ বছর ছয় মাস।

এমিলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সুভাষকে মোহিত করেছিল। এমিলির পরবর্তী কথাবার্তায় বোঝা যায়, আর যাই হোক দেখে ভালো লাগার মত মানুষ সে (এমিলি) ছিল না। এমিলি তার মেয়েকে বলত, সেই সময় সে খুবই মোটা ছিল। এমিলির সেই সময়কার ছবি দেখলে বোঝা যায় তার সুন্দর মুখাবয়ব ছিল। তাকে যদিও আহামরি সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু আকর্ষণীয়। গোছগাছ স্বভাবের মানুষ ছিল সে এবং খুবই চাপা স্বভাবের। সে ইংরেজি ভালো জানত এবং

1927 mv‡j gv›`v‡j †Rj †_‡K Qvov cvIqvi cign‡Z †Zvjv Qwe

শর্টহ্যান্ডে দক্ষতা ছিল।

এমিলি তার কাজে প্রতিদিনই আসত। সুভাষ তাকে তিন-চার ঘন্টা ডিকটেশন দিত। এমিলি সেগুলো টাইপ করে সুভাষের কাছে দিত ভুলগুলো ঠিক করে দেওয়ার জন্য। গ্রীষ্মের এই সময়টায় সুভাষ প্রচন্ড খাটাখাটনি করে লেখার জন্য। জুলাইয়ের শেষে তার লেখার পরিমাণ দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার শব্দ।

এর কয়েক মাস পরে সুভাষ দেশে আসার জন্য অস্থির হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের ২৭ মার্চ সে নেপলস্ থেকে SS Conte verde যোগে বোম্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এপ্রিলের ৮ তারিখ সকালে তার জাহাজ বোম্বে পৌঁছায় এবং তাকে সরাসরি জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বোম্বো জেলে বসে প্রথম দিন দুপুরেই চিঠি লিখে এমিলি শেঙ্কেলকে। তবে ভারতের বিভিন্ন জেলে বসে সে এমিলিকে অনেক চিঠি লিখেছে। এদেরই একটিতে প্রায় খোলাখুলিভাবে সে এমিলিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। চিঠিটা ১৯৩৭ সালের এপ্রিলের শেষে অথবা মে-র প্রথম দিকে লেখা হয়। চিঠির কিছুটা এমন-

'আমি তোমাকে কিছু মনের কথা জানাতে চাই। যদিও কাজটা সহজ নয়। তোমাকে জানাতে চাই, আমি আগে যেমন ছিলাম, এখনও তেমন আছি। এমন কোনো দিন নেই যেদিন তোমার কথা ভাবি না। সব সময় তুমি আমার সাথে আছ। সম্ভবত দুনিয়ার অন্য কারো সম্পর্কে আমি ভাবতে পারব না।'

এটা স্পষ্টতই একটা প্রেমপত্র। এই চিঠি দিয়ে সুভাষ প্রায় খোলাখুলিভাবেই এমিলিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ১৯৩৭ সালের ১৮ নভেম্বর সুভাষ আবার ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বলা হয়, একই বছরে ২৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনের পরের দিন তিনি এমিলিকে বিয়ে করেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় ঘটনার পঞ্চাশ বছর পর ১৯৯৪ সালে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঝটিকা সফর শেষে সে

†R‡bfvq GKwU cv‡Ki te‡Â weUj fvB †c‡Uj Ges mfvl (1933)

1938 mv‡j Ab¨vb¨ †bZv Kgx‡`i mv‡_ wbe©vwPZ mfvcwZ mfvl

২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে ভারতে ফিরে আসে। করাচি বিমানবন্দরে তাকে বিয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সে এড়িয়ে যায়, 'এ বিষয়ে ভাবার সময় আমার নেই।'

এর পরের দুই-তিনটা বছর তার কাটে আরো দুর্দান্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেসে সে সভাপতিত্ব করে। সভাপতির মেয়াদ এক বছর। অতএব পরবর্তী সভাপতি কে হচ্ছেন, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। প্রার্থী তিনজন : মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সীতারামাইয়া ও সুভাষ। মওলানা আজাদ সীতারামাইয়ার অনুকূলে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। বাকি রইল সীতারাইয়া বনাম সুভাষ। গান্ধীজির সরাসরি সমর্থন সীতারামাইয়ার প্রতি। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটি হল। সুভাষ পেল ১,৫০০ ভোট আর সীতারামাইয়া ১,৩৭৭ ভোট। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সুভাষ দ্বিতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়। গান্ধীজি মন্তব্য করলেন, 'সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে আমারই পরাজয়।' গান্ধীজির সমর্থন ছাড়া সুভাষ সভাপতি ঠিকই কিন্তু কংগ্রেসের অলিখিত সভাপতি কিন্তু গান্ধীই। তাই বিভিন্ন বিষয়ে তার গান্ধীর সাথে মতানৈক্য শুরু হল। মতানৈক্য এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল যে সুভাষ কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তফা দিল। তার সরল উক্তি, 'আমি জানি না গান্ধীজি আমার সম্পর্কে কী ভাবেন। আমার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, আমার সব সময়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল তাঁর আস্থা অর্জন করা। এটা হবে আমার জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের, যদি আমি সবারই আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হই অথচ ভারতের সবচেয়ে অসাধারণ লোকটির বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হই।'

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করার পর সুভাষ কংগ্রেসের মধ্যেই ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার কাজ শুরু করেছিল। এই দলের উদ্দেশ্য গান্ধীর নয়, তবে গান্ধীবাদের বিরোধিতা করা। এরই মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সুভাষের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু ছিল না। কিন্তু জার্মান ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় বাইরে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা পুরোদমে শুরু হল। বাইরে যাওয়ার চিন্তা সুভাষের করতে হত না, যদি কংগ্রেসে আন্দোলন বুঝত। সুভাষের যুক্তি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেহেতু শুরু হয়ে গেছে অতএব ব্রিটেন বিপদে আছে।

স্বাধীনতার বিষয়ে দরকষাকষির এই তো সুবর্ণ সুযোগ। ব্রিটেনকে চূড়ান্ত সময় বেঁধে দাও এবং বল 'ভারত ছাড়', নইলে ভারত তোমাদের সাথে নেই। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা সুভাষের এই প্রস্তাবে রাজি নয়।

পালিয়ে বাইরে যাওয়া চিন্তা সুভাষের মাথায় প্রথম আসে দত্ত-মজুমদারের সাথে আলাপকালে। তারা ট্রেনে করে কলকাতা ফিরছিলেন। হঠাৎ করে দত্ত মজুমদার প্রস্তাব দিয়ে বসেন '... কিন্তু আমার মনে হয় আপনার আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যাওয়া দরকার।' সুভাষ তো বিস্মিত, 'আপনি আমাকে আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে বলছেন?' 'হ্যাঁ, আপনার দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। সান-ইয়াৎ-সেনকে তার দেশ থেকে পালিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে হয়েছিল, মাজিনীকেও পালাতে হয়েছিল।' তারা নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, ট্রেন ধেয়ে চলছে কলকাতার উদ্দেশে। হঠাৎ সুভাষ বলে উঠল, 'এই আইডিয়া নিয়ে অন্য কারো সাথে আলাপ করবেন না।'

পালিয়ে বাইরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা হঠাৎ করেই স্থগিত হয়ে গেল। সুভাষ হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৪০ সালের ৩ জুলাই হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদের ডেটলাইন। ভারতের বুকে ইংরেজদের এই কলঙ্কিত চিহ্ন রাখা যাবে না। জুলাইয়ের ২ তারিখ বেলা প্রায় দুটোর দিকে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মি. জানড্রিন এলগিন রোডের বাড়িতে এসে হাজির। ভারত-রক্ষা বিধির ১২০ ধারা অনুসারে সুভাষকে গ্রেপ্তার করা হল। পাঠানো হলো প্রেসিডেন্সি জেলে। গ্রেপ্তারের খবরে সকলেই বিরোধিতা করেন এবং অবিলম্বে সুভাষের মুক্তি দাবি করেন। বিশেষ করে আন্দোলনকর্মী ছাত্ররা মুক্তির দাবিতে গর্জে ওঠে। অবশেষে হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত এল সরকারের কাছে হতে। কিন্তু সুভাষের মুক্তি হল না। অক্টোবরের ২৮ তারিখে জেল থেকেই সুভাষ কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ঠিক তার এক মাস পর, ২৯ নভেম্বর, সে সিদ্ধান্ত নিল আমরণ অনশনের। লবণ-পানি ছাড়া আর কিছু সে খাবে না। স্বাস্থ্যের অবস্থা এমনিতেই খারাপ। অনশনের ফলে অবস্থা আরো বেগতিক। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ তাকে মুক্তি দেওয়া হল। সরকার নতুন ফন্দি আঁটল। সে বাইরেই থাক কিন্তু গোয়েন্দাদের সার্বক্ষণিক নজরদারি থাকবে তার উপর। মুক্তি পাওয়ার পর একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে সুভাষকে এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল।

৭.

১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। সুভাষ প্রস্তুত, পালিয়ে যেতে হবে, দেশের বাইরে থেকে দখলদার শক্তির উপর আক্রমণ চালাতে হবে- আর সময় নেই। সে পশ্চিমী মুসলমানের ঢঙে ছদ্মবেশ নিয়েছে। রাত ১টা বেজে ২৫ মিনিট। গাড়ি প্রস্তুত। গাড়িতে মাত্র দু'জন লোক, সুভাষ এবং তার ভাই শরৎ-এর ছেলে শিশির। শিশির তখন মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া একজন লাজুক ছেলে। সুভাষের সাথে একটা স্যুটকেস, বিছানা ও একটা অ্যাটাচি কেস। এলগিন রোড হতে শুরু করে গাড়ি কলকাতা ছেড়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সাঁই সাঁই করে ছুটল। সমস্ত রাত চলার পর সকালে তারা এক জায়গায় আত্মগোপন করল। সারা দিন পর সন্ধ্যায় আবার যাত্রা শুরু হল। এভাবে তারা কলকাতা থেকে আনুমানিক ২১০ মাইল দূরে গোমোতে পৌঁছল। এ দিন শেষ রাতে সে ট্রেনে করে উত্তর ভারতের রওনা হয়ে যায়। স্টেশন থেকেই শিশির কাকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে। ট্রেন থেকে সুভাষ নামে পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। সেখানো তৈরি ছিলেন আকবর শা। ভগতরামের উপর দায়িত্ব পড়ল তাকে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। যেতে হবে পায়ে হেঁটে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল। মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত আছে। সমতল অঞ্চলের বাঙালি সন্তান সুভাষকে যে কী পরিমাণ অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল কাবুল পর্যন্ত পৌঁছাতে তা বলাবাহুল্য। সেখানেও শান্তি নেই। কাবুল শহরে বিদেশী গোয়েন্দারা গিজগিজ করছে। এক ছিঁচকে গোয়েন্দা তাদের পিছু নিল। ভগতরাম কিছু টাকা দিয়ে এক দু'বার ম্যানেজ করলেন। কিন্তু ঐ ব্যাটা ছিল নেশাসক্ত। যদি টাকাপয়সা ফুরিয়ে যেত তখনি হানা দিত সুভাষ কাবুলে যে হোটেলে উঠেছে সেখানে। ভগতরাম ভাবল এ তো মহা মুশকিল। এর মধ্যে এই ছিঁচকে গোয়েন্দা সুভাষের একমাত্র সম্বল হাতঘড়িটাও বাগিয়ে নিয়েছে। কাবুল শহরের স্থায়ী আধিবাসী উত্তম চাঁদের সহযোগিতায় কোনোরকমে তাকে লুকিয়ে চাপিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হল। এভাবে আর কতদিন লুকিয়ে থাকা যায়। জামাকাপড় নোংরা, দাঁড়ি-মোচ বড় বড়, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। সুভাষ আবারো অসুস্থ হয়ে পড়লো। এদিকে জার্মান ও রাশিয়া-কোনো দূতাবাস থেকেই কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে আর কিছুদিন কাবুলে থাকলে নির্ঘাত ধরা খেতে হবে। ভারতে রাজশক্তি ততক্ষণে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি চষে বেড়াচ্ছে সুভাষ কে ধরার জন্য। এ কী করে সম্ভব? এরকম কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি ফাঁকি দিয়ে কীভাবে সুভাষের পক্ষে দেশের বাইরে পা দেওয়া সম্ভব। অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার পর শুভ সংবাদ এল- বার্লিন রাজি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে সুভাষকে বার্লিন নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১৮ মার্চ ১৯৪১ আসল সেই শুভ সময়। ইটালিয়ান অ্যামবাসি থেকে একটি গাড়ি আসল। গাড়িতে যাত্রী চারজন। ডা. ওয়েলগার, একজন জার্মান, একজন ইটালিয়ান পোস্টম্যান ও ইউরোপিয়ান ড্রাইভার নিজে। আর একজন উঠে বসলেন গাড়িতে। তিনি সিনর অরল্যান্ডো ম্যাজোট্টা। সুভাষের নতুন ইটালিয়ান নাম। পাসপোর্টেও তাই রয়েছে। উল্লেখ্য যে কলকাতা থেকে যখন সে কাবুলের উদ্দেশে ছদ্মবেশে পালিয়ে আসছিল তখন সুভাষের ছদ্মনাম ছিল মওলানা জিয়াউদ্দিন। পেশায় ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা। যা হোক, সুভাষ রওনা হয়ে গেলেন ইউরোপের উদ্দেশে। এতোই বিপদসঙ্কুল আর অনিশ্চিত ছিল এই যাত্রা- যা কোনো সিনেমার কাহিনীকেও হার মানায়। হিন্দুকুশের উঁচুনিচু গিরিপথ, তাশকুরগানের গিরিমালা, আফগান প্রান্তরের অসংখ্যা হিমশীতল মৃত নগরী, পুণ্যতীর্থ মাজার-ই-শরীফ, ভয়াবহ জঙ্গলে ভরা বিষাদময় অক্সাস ও পাটাফেসরের জঘন্য পারঘাট পেরিয়ে অবশেষে সমরখন্দ। ২০ মার্চ টারমিজ। টারমিজ থেকে ট্রেনে মস্কো। মস্কো থেকে আকাশপথে বার্লিনে।

বার্লিনে সুভাষের অনেক কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবচেয়ে মোক্ষম মওকা ব্রিটেনকে কাবু করার জন্য। এই সুযোগে যদি সাম্রাজ্যবাদী এই হায়েনার হাত হতে ভারত মুক্ত হতে না পারে- তাহলে বলা যায় না আরো কয়শ' বছর ভারতকে পরাধীন থাকতে হবে। বার্লিনে সুভাষ আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তুললেন। একটার পর একটা বেতার ভাষণ দিচ্ছেন। মূল বক্তব্য হল- সময় এসে গেছে, এবার ভারত স্বাধীন হবে, অতএব ভারতবাসী সজাগ হোন। সুভাষ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতে লাগল। আজাদ হিন্দ রেডিও গঠন করা হল, নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করা হল।

বার্লিন থেকে আফগানিস্তান হয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ভারতে আক্রমণ করা অসম্ভব। অতএব এখন আর বার্লিন নয়। সুভাষের জাপান যাওয়া দরকার। সেখানে আছেন বিপ্লবী রাজবিহারী বসু। তিনি বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুভাষ সেখানে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে জাপান সরকারের সহযোগিতায় খুব সহজেই ভারতে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু সারা পৃথিবী যুদ্ধে আক্রান্ত। পৃথিবীর একপ্রান্তে জাপান- সুভাষ কীভাবে পৌঁছবে সেখানে? যেভাবেই হোক ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কিন্তু বার্লিন সরকার সহজে রাজি নয়। তাদের কথা হল এমন বিপদে সুভাষকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কারণ জাপান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারার সম্ভাবনা শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। সুভাষের কথা হল সম্ভাবনা শতকরা একভাগ হলেও আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবোই। স্বাধীনতা অর্জনের এমন সুবর্ণ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না। সুভাষের কথা, 'দেশের জন্য নিজের গলা বন্ধক রেখে আমি একদিন জার্মানি এসেছিলাম। দরকার হলে তেমনিভাবেই আবার একদিন চলে যাব। ব্রিটিশের সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী হাজার চেষ্টা করেও সেদিন আমাকে বাধা দিতে পারেনি। তোমাদের গেস্টাপো বাহিনীও পারবে না।' পাশাপাশি সুভাষ ইটালিতেও গেলেন মুসোলিনীর কাছে- তিনি যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন। মুসোলিনীর সাথে সুভাষের খুব ভালো সম্পর্ক থাকার পরও সে এই ঝুঁকি নিতে রাজি হল না। এই পরিস্থিতিতে সুভাষকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাঠানো অসম্ভব।

এমন দুর্দিনে আবারও এগিয়ে এলেন সুভাষের শুভাকাঙ্ক্ষী ভন ট্রট। তিনি হিটলারের কাছের লোক। নানাভাবে তিনি হিটলারকে বুঝালেন। নানা যুক্তি দিয়ে : জাপান আমাদের বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়, তাদের সাথে আমরা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু কতটুকু আমরা তাদের

সাহায্য করতে পেরেছি এবারের যুদ্ধে। তারা যখন এত করে বলছে, তখন আমাদের উচিত অবিলম্বে সুভাষ বোসকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। নইলে তারা আমাদের ভুল বুঝতে পারে। যুক্তিটা মনে ধরল হিটলারের। তিনি ভাবলেন বোসকে জাপান পাঠানো ঝুঁকি আছে সত্য আবার ট্রটের কথায়ও যুক্তি আছে।

বিশেষ করে ভন ট্রট সুভাষ যে কী জিনিস তা ভালো করেই জানতেন। যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন সুভাষ চাইলেন ভারত বিষয়ে জার্মান, ইটালি ও জাপানের ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা। সুভাষ বুঝিয়ে শুনিয়ে মুসোলিনীকে রাজি করালেন যে, এখনই উপযুক্ত সময় ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা দেওয়ার। জাপানের জেনারেল তোজোও ভারতকে সাহায্য করার জন্য একপায়ে খাড়া। তাঁর বিখ্যাত উক্তি : India for the Indians. অতএব এখনই সময় ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা আসার। কিন্তু বেঁকে বসল হিটলার। হিটলার মনে করেন ভারতের ব্যাপারে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণার সময় এখনও আসেনি।

২৮ মে সুভাষের সাক্ষাৎ হলো হিটলারের সাথে। সে হিটলারকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে জাপানের কাছে সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে, বার্মাও জাপানের হাতে চলে গেল- প্রায়। সুতরাং এখন ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার লগ্নকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এ ব্যাপারে ইটালি ও জাপান রাজি হলেও হিটলার রাজি হতে পারলেন না। কারণ যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই তাদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান শুরু হয়ে গেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। এ সময়ে অন্য কোনো কিছু চিন্তা করার মতো অবকাশ কোথায়? তাছাড়া ভারতবর্ষ এখনো অনেক দূরে। এতো দূর থেকে জার্মানির পক্ষে আপাতত এ দায়িত্ব নেয়া কী করে সম্ভব? ঘোষণা করা মানেই তো দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া। বর্তমান সময়ে জার্মানির পক্ষে তা সম্ভব কি? হিটলার আরো বলেন, মিসরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব, কারণ ইতোমধ্যেই জেনালের রোমেল পৌঁছে গেছেন মিসরের দ্বারপ্রান্তে। তাদের স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়াও তৈরি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সে অবস্থা এখনও আসেনি। কথাটা মেনে নিতে পারলেন না সুভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন হিটলারকে। নানা যুক্তি দিয়ে। ভারতবর্ষের সমর্থন পেতে হলে এখনই ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা করা উচিত।

অপরপক্ষে হিটলারেরও যুক্তির শেষ নেই। পরিস্থিতি সত্যিই বড় গুরুতর। হিজ এক্সেলেন্সি মাসসোত্তা (অর্থাৎ সুভাষ) রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আশা করি।

আর যায় কোথায়! সুভাষকে রাজনৈতিক দৃষ্টি শেখাচ্ছেন হিটলার! সাথে সাথে সুভাষের সাফ জবাব, 'সারা জীবন আমার রাজনীতি করেই কেটেছে, কারো কাছ থেকে আমার উপদেশ প্রয়োজন নেই।'

উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী স্তম্ভিত! জার্মানির ভাগ্যবিধাতা, ১৯৪২ সালের মহাপরাক্রমশালী হিটলারকে কেউ মুখের ওপর এমন জবাব দিতে পারে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

পরিস্থিতি হালকা করে দিলেন ভন ট্রট। দোভাষী হিসেবে কথাটা তিনি একটু নরম করে বুঝিয়ে বললেন হিটলারকে। উদ্দেশ্য, দু'পক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ট্রটের সহযোগীতায় সুভাষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর ব্যাপারে জার্মানকে রাজি করানো গেল। কিন্তু যাবেন কী করে। জাহাজে সম্ভব নয়। বিমানেও সম্ভব নয়- গেলে একমাত্র পথ সাবমেরিনে। কিন্তু তাতেইবা ভরসা কোথায়? কখন যে টর্পেডো, মাইন, ডেপথ্-চার্জ বা ভারী কামানের পাল্লার মধ্যে পড়ে যেতে হবে তা কে বলতে পারে। বরং সেটাই তো স্বাভাবিক। স্থলে, জলে, আকাশে-বাতাসে যুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল জাহাজ নয়, বিমানও নয়, যেতে হবে সাবমেরিনেই। অবশ্য বিপদ সবদিকেই আছে, তবু সাবমেরিনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। মাত্র একজন যেতে পারবে তার সাথে সঙ্গী হিসেবে। প্রথমবারের পথই সবচাইতে বিপদসঙ্কুল। সে দায়িত্ব বহন করবে জার্মান সরকার। তাঁরা পৌঁছে দেবে দক্ষিণ আফ্রিকা সংলগ্ন মাদাগাস্কারের মাঝামাঝি একটা স্থানে। বাকি অংশের দায়িত্ব জাপান সরকারের।

সাবমেরিন পরিকল্পনার প্রথমেই বাধা এল জাপানি নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে। জাপানি আইনে অসামরিক লোকের পক্ষে সাবমেরিন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুভাষ চন্দ্র বোস তাহলে যাবেন কী করে? উত্তর দিলেন সেই ভন ট্রট। তার যুক্তি হল, সুভাষ বসু ইন্ডিয়ান আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ। তিনি অসামরিক লোক হলেন কী করে? একথা শুনে সবাই চুপ। আর একটি কথাও শোনা গেল না জাপানি নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে।

অত্যন্ত গোপনে আয়োজন করা হল সবকিছুর। সুভাষ সবাইকে বলছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছু দিনের জন্য রাশিয়া ফ্রন্টে যাচ্ছি। অতএব চিন্তার কোনো কারণ নেই। খুব শিগগিরই ফিরে আসছি। জার্মান গোয়েন্দা সংস্থার সর্বোচ্চ সতর্কতার মধ্য দিয়ে তার সফরের ব্যবস্থা করা হল। কাক-পক্ষী টের পেলেও সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে কে যাবে? মাত্র একজনকে সঙ্গে নেয়া যাবে। কে সেই লোক? কী তার নাম? -আবিদ হাসান। হায়দ্রাবাদের তরুণ ছাত্র বার্লিনে অধ্যয়নরত আবিদ হাসান। তিনিই সেদিন সুভাষের সাথে পাড়ি দেবেন তার একান্ত সচিবরূপে।

একে একে সুভাষ সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ফৌজী ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় সুভাষের অন্তরাত্মা যেন ফেটে যাচ্ছিল। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সাল। বার্লিনের লেহ্টার ব্যানহফ (Lehrter Banhof) রেল স্টেশন। ফিয়েলগামী গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে। আর দেরি নেই। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্ধর্ষ জার্মান গোয়েন্দার দল। চোখে-মুখে তাদের শাণিত তলোয়ারের দৃষ্টি। হিজ একসেলেন্সি সুপ্রিম কমান্ডার আজাদ হিন্দ ফৌজ- নেতাজী সুভাষ বসু আজ যাবেন লেহ্টার ব্যানহফ স্টেশন হয়ে। এ সতর্কতা শুধু তারই প্রয়োজনে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। রেল স্টেশন, বিমানঘাঁটি, বন্দর কিছুই এখন আর নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বিভাগও এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি তৎপর। কোথায় কে ঘাপটি মেরে বসে আছে বলার উপায় নেই। সাবমেরিন কমান্ডারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বার বার। শত্রু পক্ষের জাহাজ পেলেই তারা যেন অস্থির না হয়ে ওঠে। গোলাগুলি না শুরু করে দেয়। এ যাত্রায় এসব একদম চলবে না। কোনো রকম ঝুঁকি এ ক্ষেত্রে নেওয়া নেয়া যাবে না। একটিবারের জন্যও না। সুতরাং এগুতে হবে একেবারে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। ঠিক একইভাবে, একই সময়ে ওদিক থেকে জাপানি সাবমেরিনকে পাড়ি দিতে হবে সময়ের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব করে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। হাজার চেষ্টা করলেও তখন কেউ কারো দেখা পাবে না মাদাগাস্কারের সেই নির্দিষ্ট স্থানে। লেহ্টার ব্যানহফ থেকে ট্রেনে সুভাষ এল জার্মানির উত্তর সীমানায় অবস্থিত কিয়েল বন্দরে। ওখানেই তখন I/29 নম্বর সাবমেরিনটা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। সেই চরম বিপর্যয়ের মুখে (চারদিকে মার খেয়ে যুদ্ধে জার্মানিদের অবস্থা তখন খারাপ) একজন ভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনে একটি সাবমেরিন ব্যবস্থা করা- এটা সত্যিই অভাবনীয়। সেই অভাবনীয় সম্মান সেদিন জার্মানি দিয়েছিল সুভাষকে।

সেই বিদায় মুহূর্তে মাত্র তিনজন লোক ছিল সুভাষের পাশে। সতর্কতার জন্য আর কাউকেই জানতে দেওয়া হয়নি এই ঐতিহাসিক সফরের বিষয়ে। সুভাষের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। নাম্বিয়ারই একমাত্র লোক যিনি জানতেন তার এই পরিকল্পনার কথা। জার্মানির পক্ষ থেকে ছিলেন স্টেট সেক্রেটারি কেপ্লার আর বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজান্ডার ওয়র্থ। সুভাষের সাথে আছে সহযাত্রী আবিদ হাসান। গন্তব্য সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না এবং তাকে কিছু জানানোও হয়নি। তাঁর ধারণা সুভাষের সাথে তিনি গ্রিস পরিভ্রমণে যাচ্ছেন। তাই সঙ্গে নিয়েছেন সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে গ্রিক ভাষায় লিখিত একটি সহজপাঠ্য বই- সুবিধা হবে বলে।

কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সাবমেরিন কমান্ডার তখন প্রস্তুত। আর দেরি করা চলবে না। সবগুলো ট্যাঙ্ক পানিতে ভর্তি হয়ে গেছে। সময় হয়ে এল বলে। এখন শুধু ডুব দেওয়ার অপেক্ষমাত্র। স্থির অপলক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। ঐ যে সাবমেরিনটা ডুবতে শুরু করেছে সুভাষকে নিয়ে। ঐ যে এর পেরিস্কোপটা এখনও জেগে আছে পানির উপরে।

না, আর নেই। খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোনো কিছুই এখন নজরে পড়ছে না সমুদ্রের বুকে। সব শান্ত, সব স্থির। সাবমেরিন যাত্রার কথা এতোটাই গোপন ছিল যে একমাত্র ইউ-বোটের কমান্ডার ছাড়া আর কেউই এ ব্যাপারে জানতেন না। যাত্রার তারিখও কয়েকবার পরিবর্তন করা হয় অধিকতর সুবিধার

জন্য। ৯ ফেব্রুয়ারি বোট নোঙর তুলল। তাতে চেপে বসলেন সুভাষ ও সঙ্গী আবিদ হাসান। সাবমেরিনের নাবিকরাও প্রথমে বুঝতে পারেনি ওরা কারা, কোথায় যাবে, এখানেই বা উঠল কেন? বোটে সুভাষ ও আবিদ পরিচয় দিল যে তারা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, নরওয়ের উপকূলে তাদেরকে নামিয়ে দিলেই চলবে। কয়েকদিন পর বোট এসে নোঙর ফেলল নরওয়ের উপকূলে একটি সমুদ্র খাঁড়িতে। তারা সেখানে একদিন মাত্র ছিল। তারপর আবার ইউ-বোট চলতে শুরু করল। নাবিকরা লক্ষ্য করল লোক দু'জনের নরওয়ে উপকূলে নেমে পড়ার কথা থাকলেও নামেনি। এবার সবাই জানতে পারল আসল ব্যাপার কী। নাবিকরা সকলেই জানতে পারল- সুভাষ চন্দ্র বসু ও তার অ্যাডজুট্যান্ট আবিদ হাসান চলেছেন এই বোটের যাত্রী হয়ে। তারা বুঝে নিল কোথায় গিয়ে তাদের যাত্রা শেষ হবে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে সাবমেরিন। ভাসমান অবস্থায় ঘণ্টায় বিশ নট। পানির নিচে ঠিক তার অর্ধেক। অর্থাৎ ঘণ্টায় দশ নট মাত্র। এখন আরো কম।

সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ এই যাত্রা। কোনো নিশ্চয়তা নেই গন্তব্যের ব্যাপারে। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র এখন শুধু মৃত্যুর প্রতিধ্বনি। মৃত্যুটাই এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। চারপাশের শত্রুপক্ষের বেড়াজাল। ব্যাটল শিপ, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার, বিমানবহর, ডেপথ্ চার্জ, টর্পেডো সবকিছু যেন হা করে বসে আছে হিংস্র হায়েনার মতো। একটু টের পেলে আর রক্ষা নেই। সুতরাং যেতে হবে খুব সাবধানে। সবচাইতে মারাত্মক হল ডুবন্ত মাইনগুলো। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইন। বলতে গেলে গোটা উপকূলভাগটাকেই ওরা ঘিরে রেখেছে শক্তিশালী ডুবন্ত মাইন দিয়ে। এর যেকোনো একটার সাথে সামান্য সংঘর্ষ হলেই মৃত্যু অনিবার্য।

ঘুম নেই সদাসতর্ক সাবমেরিন কমান্ডার মুসেমবার্গের চোখে। সারা চোখে তার রাত জাগার ক্লান্তি রেখা। মাথার উপর কর্তব্যের গুরুভার। যে করে হোক হিজ এক্সেলেন্সী সুপ্রিম কমান্ডার আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী সুভাষ বোসকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতেই হবে। স্বয়ং ফুয়োবারের আদেশ।

ওদিকে তখনো ১৯.৭১ ওয়েভ লেংথে সুভাষের রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর একটানা বেজে চলেছে হুইজেনে অবস্থিত আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে। ঘোষণায় সে ভারতবাসীকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

নিজের কেবিনে বসে সুভাষ তখন তার আগামী দিনের সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। ছোট্ট কেবিন। খুবই ছোট্ট। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। দু'পা হেঁটে চলার মতোও জায়গা নেই। সেদিকে সুভাষের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যে দেহের ওজন ১৫ পাউন্ড কমে গেছে, তবুও সে নির্বিকার। রাতদিন পানির নিচে থাকতে থাকতে চেহারা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মুখে একগাল দাড়ি, গায়ে জার্মানি নৌ-বিভাগের পোশাক, মুখে নির্ভুল জার্মান ভাষা। এই অবস্থায় আসল সুভাষকে চেনা খুব সহজ নয়। শত্রুপক্ষের কাছে যেকোনো সময় ধরা পড়ে গেলে তখন বলা হবে 'আমি তো সুভাষ নই- এই সাবমেরিনেরই একজন জার্মান অফিসার মাত্র।'

কাগজ-কলম নিয়ে আবিদ হাসান প্রায় সব সময়ই প্রস্তুত। সুভাষ তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা। তার নির্দেশমতো প্রতিটি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট নোট করে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে এসে সাবমেরিন কমান্ডার তাদের খোঁজ নিয়ে যান।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে (রাত ৩টা) সাবমেরিন পানির উপর ভেসে উঠে। পানির ট্যাঙ্কগুলো একে একে খালি করে দেয়া হয়। সাবমেরিন ভেসে উঠতেই প্রায় সবাই আসে কোনিং টাওয়ারে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় সবাই।

ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে মার্চ। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এগিয়ে চলছে সাবমেরিন। আগে হলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে সুয়েজ খাল পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে যাওয়া যেত। তাতে দুরত্বও অনেকটা কমতো। সে পথ এখন একেবারেই রুদ্ধ। আফ্রিকা এখন পুরোপুরি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলে। তাই যেতে হবে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আটলান্টিক, উত্তমাশা, অন্তরীপ পেরিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে। এ পথে বিপদ আরো বেশি। কী ঘটে খোদা মালুম।

আমেরিকা থেকে খাদ্য এবং অস্ত্র নিয়ে বিরাট একটা কনভয় এগিয়ে চলেছে আটলান্টিকের বুকে ঝড় তুলে। ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার কিছুই তার মধ্যে বাদ নেই। সব মিলিয়ে প্রায় শ'দুয়েক জাহাজ। মাঝখানে মাল বোঝাই আসল জাহাজগুলো। ডেস্ট্রয়ার এবং ক্রুজারগুলোর কাজ হলো তাদের পাহারা দিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়া। কনভয়টি যাবে ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে তখন খাদ্যের আকাল চলছে। পৃথিবীতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এমন বন্ধু আর কে আছে, যারা এই দুর্দিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

যেতে যেতে হঠাৎ একটা জাহাজ (Frieghter) থেমে গেল, তারপরই শোনা গেল ক্যাপ্টেনের বিপদসূচক সঙ্কেত- রেডি! রেডি! রেডি! চারদিকে সতর্ক সৃষ্টি রাখ! মনে হচ্ছে শত্রুপক্ষের কোনো একটা সাবমেরিন আশপাশেই কোথাও আছে।

নিজের কেবিনে বসে সুভাষ তখন তার ঝাঁসীর রানী বাহিনীর পরিকল্পনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ মাইক্রোফোনে শোনা গেল সাবমেরিন কমান্ডারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর- সাবধান! আমরা শত্রুর বেড়াজালের মধ্যে আটকা পড়েছি। খুব হুশিয়ার! ঘোষণাটি সুভাষ শুনল তারপরই আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। সাথের আবির হাসান মুখে কিছু প্রকাশ করছে না কিন্তু অন্তরে ঝড় বইছে। এই বুঝি মৃত্যু এসে ছোবল দিল।

আবির হাসানের ঘোর ভেঙে দিয়ে সুভাষ বলল- আমি দু'বার বললাম, তা এখনো কি না তুমি কথাটা নোট করে নিলে না!

- আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার। সম্বিত ফিরে পেয়ে নিমেষে আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন আবিদ হাসান।

সাবমেরিন শত্রুপক্ষের নজরে পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে মহাবিপদ। এখন কী করা? আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বজ্রকণ্ঠে সাবমেরিন কমান্ডার হাঁক দিলেন, রেডি! চার্জ টর্পেডো-

কিন্তু হায়! কোথায় টর্পেডো চার্জ আর কোথায় রইল কী! সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল কন্ট্রোল রুমের মারাত্মক একটি ভুলের জন্য। ফলে টর্পেডো চার্জের পরিবর্তে গোটা সাবমেরিনটাই ভেসে উঠল পানির ওপর। আর যায় কোথায়! মুহূর্তে সেই জাহাজটা (Frighter) তার গতি পরিবর্তন করে ঝড়ের মতো ছুটে আসতে লাগল সাবমেরিনটাকে লক্ষ্য করে। বিপদ দেখে সাবমেরিন কমান্ডার উত্তেজিতভাবে আদেশ দিতে লাগলেন- ডাইভ! ডাউভ! ডাইভ! সবগুলো ট্যাঙ্ক পানিতে ভর্তি করে শিগগির নিচে নেমে যাও। কুইক! কুইক! না, আর আশা নেই। জাহাজটা একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আর দশ ফুট মাত্র বাকি। প্লিজ ডাইভ। ফর গড সেক্...! জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি একটা মুহূর্ত। আর বুঝি শেষ রক্ষা হলো না। জাহাজটা এসে পড়েছে। আর মাত্র তিন ফুট বাকি।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে সাবমেরিনটা কাত হয়ে গেল এক পাশে। সবশেষ, এবার মৃত্যু অবধারিত।

কিন্তু না, এবার আর ভুল হয়নি কন্ট্রোল রুমের, তাই ধাক্কা লেগে ব্রিজের রেলিং-এর কিছুটা অংশ ভেঙে গেলেও স্বাভাবিকভাবেই সাবমেরিনটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সাগরের নিচে। হাজার চেষ্টা করেও আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল কমান্ডারের। বিপদ কেটে গেছে, আর ভয় নেই। সাবমেরিন চলতে লাগল, আগের মতো আবার সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। আশ্চর্য, সুভাষ তখনও ঠিক তেমনিভাবেই কাজের মধ্যে ডুবে আছে একান্ত সচিব আবিদ হাসানকে নিয়ে।

মার্চ পেরিয়ে এপ্রিল। তখনো সাবমেরিনটা এগিয়ে চলেছে সেই একইভাবে। লক্ষ্য মাদাগাস্কার উপকূল থেকে চারশ' মাইল দূরবর্তী সেই নির্দিষ্ট স্থান। শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ধ্বংসের ব্যাপারে ব্রিটিশদের Anti-submarine Dictation Investigation Committee (A.S.D.I.C.) তখন অত্যন্ত তৎপর। একবার তাদের রাডারযন্ত্রে ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। তবুও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ব্যাটারি চার্জ এবং রসদ নেওয়ার প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই সাবমেরিনটাকে পানির উপর ভেসে উঠতে হয়।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে সুভাষ কিছুটা অস্থির হয়ে উঠল। যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই ৮ ফেব্রুয়ারি, আর কতোদিন লাগবে? সুভাষ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে- এখন কোথায় আছি আমরা। কমান্ডার উত্তর দেন- আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলের কাছাকাছি। মনে হয় আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা কেপটাউনের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারবো।

সুভাষ প্রশ্ন করেন : তারপর? তারপর পোর্ট এলিজাবেথের গা ছুঁয়ে ডারবানের উপকূল।

সেখান থেকে মাদাগাস্কারের চারশ' মাইল দূরবর্তী সেই নির্দিষ্ট স্থান। কোনো রকম বাধা না পেলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাব আশা করি।

হঠাৎ করেই কমান্ডারের মুখে আবারও সেই সতর্ক বাণী- পানির চাপ থেকে মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও একটা ব্রিটিশ কার্গোশিপ আছে। 'ব্রিটিশ' কথাটা শুনেই সুভাষ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। হাসান বুঝতে পারছে না হঠাৎ করে কী হল? নেতাজী এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন? এই যাত্রা যারপরনাই বিপজ্জনক, একটু এদিক-ওদিকে হলে মৃত্যু অবধারিত। সেই ভয়ে ভীত হবার মতো লোক আর যেই হোক না কেন, সুভাষ নয়। কিছুক্ষণ পরই গর্জে উঠল সুভাষ, তার নির্দেশ : পানির ট্যাঙ্কি খালি কর। পেরিস্কোপ তুলে দেখ ব্রিটিশ কার্গো-শিপটা কতদূর আছে। তারপর টর্পেডো চার্জ কর।

এ কথা শুনে সাবমেরিন কমান্ডার তো আকাশ থেকে পড়লেন। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। কী করবেন তিনি। এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা। জার্মানির নৌ-বিভাগের প্রধান স্বয়ং তাকে বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন এ সময়ে কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। আগে নেতাজীকে জাপানি সাবমেরিনে তুলে দেবে, তারপর অন্য কথা। সে কথা অগ্রাহ্য করার সাধ্য তার কোথায়? যদি তার ফলে কোনো রকম অঘটন ঘটে! যদি তলিয়ে যায় সব!

কিন্তু না কোনো উপায় নেই। কারণ নৌবাহিনী প্রধানই আবার এক সময় কমান্ডারকে বলেছিল, মনে রেখ, সবার উপর নেতাজী। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো, কোনো রকমেই যেন তার নড়চড় না হয়। সুতরাং যত বড় ঝুঁকিই থাক না কেন, নেতাজীর এই নির্দেশ তাকে মেনে নিতেই হবে।

কমান্ডারের নির্দেশে দেখতে দেখতেই সাবমেরিনের পেরিস্কোপটা এক সময় মাথা তুলে দাঁড়াল পানির উপরে। অনুমান মিথ্যা নয়। ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ। তবে একটা নয়, পর পর কয়েকটা। উপকূলভাগের গা ঘেঁষে দিব্বি তারা এগিয়ে চলেছে সমরাস্ত্র বোঝাই করে। লক্ষ্য তাদের ইংল্যান্ড।

বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন সাবমেরিন কমান্ডার - চার্জ... বলতে না বলতেই একটার পর একটা টর্পেডো পানি ভেদ করে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল নিকটস্থ মালবাহী জাহাজটাকে লক্ষ্য করে। কুপোকাত হয়ে গেল মালবাহী জাহাজ। খুব চেষ্টা করল তারা জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সব বৃথা। তার আগেই শোনা গেল কান ফাটানো বিকট আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে গোটা জাহাজ কেঁপে উঠল ঘড় ঘড় করে। তারপর আর কিছু নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। আকাশ-ছোঁয়া কুণ্ডলীকৃত রাশি রাশি কালো ধোঁয়া। সেই সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা।

৮.

২০ এপ্রিল, ১৯৪৩ সাল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পেনাং বন্দর থেকে সেদিন একটি জাপানি সাবমেরিন ডুব দিল কমান্ডার ইজুর (Izu) নেতৃত্বে। লক্ষ্য, মাদাগাস্কারের উপকূল সংলগ্ন সেই নির্দিষ্ট স্থান। জার্মানির দায়িত্ব সেখানেই শেষ। পরবর্তী দায়িত্ব জাপান সরকারের। তারাই সুভাষকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে একটি জাপানি সাবমেরিনের সাহায্যে। এ পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ইত্যাদি প্রতিটি সমুদ্রপথে তখন জাপানের আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ব্রিটিশ, মার্কিন, ওলন্দাজ শক্তিসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি স্থান থেকে তখন বিতাড়িত।

২৬ এপ্রিল ১৯৪৩ সাল। মাত্র ছয় দিনে জাপানি সাবমেরিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হাজির, কিন্তু কোথায় কিয়েল থেকে চন্দ্র বোসকে (জাপানিরা সুভাষকে এভাবেই ডাকতো) নিয়ে আসা সেই সাবমেরিন! সেই সাবমেরিন এখনো এসে পৌঁছায়নি; কারণ নির্দিষ্ট সময়ের দশ ঘণ্টা আগেই জাপানি সাবমেরিন যথাস্থানে এসে হাজির হয়ে গেছে। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ঠিক দশ ঘণ্টা পর গভীর রাতে সাবমেরিন I/29 এসে হাজির হল মাদাগাস্কার সংলগ্ন সেই নির্দিষ্ট স্থানে। প্রথমেই পানি ফুঁড়ে ভেসে উঠল একটি সতর্ক পেরিস্কোপ। তারপর গোটা সাবমেরিনটাই। জার্মান ক্যাপটেন মুসেমবার্গের ভাষায়, 'আগের ব্যবস্থামত নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট স্থানে আমরা রাতে জাপানি সাবমেরিনটিকে দেখতে পেলাম। খুব ছোট একটি কালো ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল জাপানি সাবমেরিনটাকে। কিন্তু বাইরের আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ এবং ঢেউয়ের তোড়ে সমুদ্রও ছিল অশান্ত। সুতরাং দুই বোট পরস্পরের কাছে আসতে পারছিল না।

জাপানি কমান্ডার ইজু তখন রীতিমতো সতর্ক। যুদ্ধের সময় কাউকেই বিশ্বাস নেই। আগে ভোর হোক, তারপর দেখে-শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে এগোনো যাবে। তাছাড়া সমুদ্রের বুকে তখন ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়। এ অবস্থায় কাছাকাছি এগোতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য; তাই দু'টি সাবমেরিনই একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে রইল সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে।

ভোরের আলোয় সবকিছু দেখে-শুনে নিঃসন্দেহ হলেন কমান্ডার ইজু। হ্যাঁ, এটাই সেই সাবমেরিন। তবু কোনো সুরাহা হল না, সমুদ্র তেমনি অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় আরো বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুন্ডলীতে যেন তারই আভাস।

উত্তরদিকে যাওয়ার জন্য জার্মান সাবমেরিনকে সিগন্যাল দিয়ে জানালেন কমান্ডার ইজু। আরো উত্তরে। ওখানে ঝড়ের দাপট কিছুটা কম হলেও হতে পারে। দেখা যাক একবার চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ হল না।

দুপুরের দিকে ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে দু'জন জার্মান (একজন অফিসার, অন্যজন যোগাযোগ রক্ষাকারী) সাবমেরিন থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে। উদ্দেশ্য হল সাঁতার কেটে এগিয়ে এসে দুটি সাবমেরিনের মধ্যে একটা দড়ি বেঁধে দিয়ে যোগসূত্র স্থাপন করা। এক ঘণ্টা প্রাণপণ পরিশ্রম করার পর যোগসূত্র স্থাপিত হল, তবুও আসল সমস্যার কোনো সমাধান হল না। সামুদ্রিক ঝড় সেই একইভাবে বয়ে চলেছে। এ ঝড় কখন যে থামবে তা খোদা মালুম। অবশ্য উত্তরদিকে আরো কিছুটা যেতে পারলে হয়তো কিছুটা সুবিধা হতো কিন্তু জার্মান সাবমেরিনের পক্ষে তাও আর সম্ভব নয়। কারণ, সাবমেরিনের তেলের পরিমাণ প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। এ অবস্থায় এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমন কঠিন সমস্যায় কী করা যায়। এ নিয়ে সবাই দুশ্চিন্তায় আছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। এই ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে হিজ একসেলেন্সি নেতাজী সুভাষ বোসের ব্যাপারে কোনো রকম ঝুঁকি নেয়া যাবে না। দরকার হলে তার জন্য আরো চব্বিশ ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হবে। তা-ই করা হল।

দু'দিন পর ২৮ এপ্রিল ভোর বেলায় জার্মানি সাবমেরিন ত্যাগ করে সহযাত্রী আবিদসহ সুভাষ একটি রাবার বোটে চেপে বসল, উদ্দেশ্য– জাপানি সাবমেরিন। বিপদ এল অন্য দিক থেকে। রাবার বোট দেখেই কোত্থেকে যেন ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য ক্ষুধার্ত হাঙর। সে কি তাদের লেজের ঝাপটানি! যেন নিজ রাজ্যে অনধিকারীর প্রবেশকারী প্রাণী দুটোকে উদরে না পাঠানো পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি নেই তাদের।

দড়ি ধরে ধীরে ধীরে রাবার বোটটা এগিয়ে চলল উত্তাল ঢেউয়ের সাথে লড়াই করে। ধীর মন্থর গতি। বাতাসের বেগে একবার উল্টে গেলে আর রক্ষা নেই। হাঙরের দল তৈরিই আছে। ততক্ষণে তাদের লেজের ঝাপটায় সুভাষের জামা-কাপড় ভিজে একাকার।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় সুভাষের বোট এসে জাপানি সাবমেরিণের কাছে পৌঁছতেই তাকে একযোগে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কমান্ডার ইজু এবং সাবমেরিনের অন্যান্য অফিসারবৃন্দ। সুদূর বার্লিন থেকে তার আগমন নিঃসন্দেহে এক অভাবনীয় ইতিহাস। এ ইতিহাসের সত্যিই তুলনা নেই।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। কেউ ভাবতে পারেনি ভয়াবহ এই যুদ্ধের মধ্যে এ অভিযান কোনোদিনও সার্থক হবে। হিটলার, মুসোলিনী, তোজো- কেউ না। ভাবতে পেরেছিল শুধু একজন, অসম্ভবের নায়ক - সুভাষ।

২৮ এপ্রিল ১৯৪৩ সাল। আবার যাত্রা শুরু হল নতুন করে। নতুন দেশে। নতুন পরিবেশে। নতুন পরিচয়ে।

এবার জাপানি সাবমেরিনে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কমান্ডার ইজু সুভাষকে নিয়ে যাবেন পেনাং বন্দরে। সুভাষ এখন আর সুভাষ নয়- 'কমান্ডার মাৎসুদা'- তার নতুন নাম। উদ্দেশ্য সেই একই, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। এই নিয়ে মোট তিনবার নাম পরিবর্তন করতে হল সুভাষকে। কোলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত 'মৌলবী জিয়াউদ্দিন', কাবুল থেকে বার্লিন পর্যন্ত 'সিনর অরল্যান্ডো ম্যাজোট্টা'। তারপর জাপানি সাবমেরিনে এখন 'কমান্ডার মাৎসুদা'।

জার্মান সাবমেরিনে সুভাষের কেবিনটি ছিল খুবই ছোট। দুইপা হাঁটাচলাও রীতিমতো কষ্টকর ছিল সেখানে। সেদিক থেকে এখানকার ব্যবস্থা

খুবই উন্নত। তাদের জন্য আগে থেকেই উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল।... দিনের বেলা তারা তিনবার খেত এবং আরেকবার রাতে।

এ পর্যায়ের যাত্রায় সুভাষ একদম ক্লান্তিবোধ করেনি। সাবমেরিনের প্রতিটি সেকশন ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধিৎসু মন দিয়ে সে পর্যবেক্ষণ করেছে।

এপ্রিল মাস শেষ। শুরু হল মে মাস। ভারত সাগরের নিচ দিয়ে সাবমেরিনটা তখন এগিয়ে চলেছে মালাক্কা প্রণালীর দিকে। অদূরে পেনাং। মনে হয় আর দু'তিন দিনের মধ্যেই পৌছানো যাবে পেনাং বন্দরে।

হঠাৎ সেদিন বেতারের মাধ্যমে একটি সাংকেতিক নির্দেশ ভেসে এল জাপান নৌবিভাগের সদর দপ্তর থেকে। নির্দেশের অর্থ হল পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে পেনাং বন্দরে সাবমেরিন নোঙর করা যাবে না। কীভাবে যেন খরবটা সেখানে ফাঁস হয়ে গেছে যে সুভাষ আসছে। সবার মাঝেই দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা। এ অবস্থায় কোনো রকম ঝুঁকি নেয়া মোটেও ঠিক হবে না। তাই, পেনাং-এর পরিবর্তে সাবান বন্দরে চলে যাও। আমরা নির্দেশ পাঠাচ্ছি ওখানকার বন্দর কর্তৃপক্ষকে।

ভেতরে ভেতরে সুভাষ তখন খুশিতে ভরপুর। কতোদিন ডাঙার মুখ দেখা হয়নি। আর মাত্র তিন দিন বাকি। তারপরই দীর্ঘ বন্দি জীবনের পরিসমাপ্তি।

এতোদিনে সাবমেরিনের সবার সাথেই চমৎকার একটা সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। সুভাষ নিজে থেকেই সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন ছবি তোলার জন্য। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না, স্মৃতি তোলা থাক।

৬ মে ১৯৪৩ সাল। সাবান এসে গেছে। সাবমেরিন ভেসে উঠবে পানির ওপরে। আর দেরি নেই।

সাবমেরিন ভেসে উঠতেই সহযাত্রী আবিদ হাসানকে নিয়ে কোনিং টাওয়ারে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন সুভাষ।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! যাত্রা শুরু হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি। আজ ৬ মে। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ অবারিত মুক্তি।

৯.

এর পরের দিনগুলোতে সুভাষ ঝড়ের গতিতে কাজ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যে দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশের বাইরে থেকে সফলভাবে একটি যুদ্ধের আয়োজন করেছে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক দক্ষতা তার অসাধারণ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের অবিসংবাদিত নেতা রাসবিহারী বসু। যুদ্ধের ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সুভাষ তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। রাসবিহারী সকল দায়িত্ব তুলে দিলেন সুভাষের হাতে। সুভাষ ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে তুললেন Indian National Army (INA)। গঠন করলেন অস্থায়ী প্রবাসী সরকার। সুভাষ হল রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান। বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল সুভাষের প্রবাসী সরকারকে। যেমন : জাপান, বার্মা, ক্রোশিয়া, জার্মানি, মাঞ্চুকু, চীনের নানকিং সরকার, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড। সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে অভিনন্দনবার্তা পাঠালেন ঐতিহাসিক সিনফিন আন্দোলনের প্রধান, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডি. ভ্যালেরা।

সেনাবাহিনীর অন্যান্য কর্মকান্ড চালানোর জন্য টাকার প্রয়োজন। এখন তারা আলাদা একটি রাষ্ট্রের মুখপাত্র- তাই কারো দয়ায় তো আর চলা যায় না। তাছাড়া ভারত আক্রমণের সময় হয়ে গেছে। আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী সারমেয়দের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে ভারতের বুক থেকে। অতএব এখন আইএনএ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পালা। কিন্তু অস্ত্র দরকার, খাবার দরকার- সেজন্য দরকার টাকা। প্রয়োজন মতো চুক্তি করলেন জাপানের সাথে, ঋণ নিলেন প্রয়োজনমতো। কথা একটাই, স্বাধীন ভারতে গিয়ে সব কড়ায়- গণ্ডায় ফিরিয়ে দেব।

অবশেষে ভারত আক্রমণ করা হল। প্রবাসী সরকারের অধীনে এল আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জিওয়াদি এস্টেট এবং ১৫ হাজার বর্গমাইল ভারতীয় এলাকা। কিন্তু দলের মধ্যেই বিদ্রোহ দেখা দিল এক সময়। বিশ্বাসঘাতকতার মতো ঘটনাও ঘটেছে। অনেক সৈনিক শহীদ হয়েছেন যুদ্ধে।

১৯৪৫ সালের এপ্রিলের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পট পরিবর্তিত হয়ে গেল। ব্রিটিশ আর্মিরা বার্মা প্রায় দখল করে ফেলেছে। আজাদ হিন্দ বাহিনী সংকল্প করলো ব্রিটিশ আর্মিরা পুরো বার্মা দখল করে ফেললেও আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু বার্মার আর্মিরা ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করায় তা আর সম্ভব হয়নি।

অতএব পিছুহটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সুভাষ রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন। ৭ মে ১৯৪৫ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলো জার্মান। হিটলার আত্মহত্যা করেছেন, আত্মহত্যা করেছেন প্রচার-সচিব ড. গোয়েবলস এবং গেস্টাপো বাহিনীর প্রধান হেনরিক হিমলার। ১ মে পতন হয়েছে রেঙ্গুনের। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ। মিত্রশক্তি পুরো শক্তি ঢেলে দিল জাপানের উপর। জাপানের অবস্থা তখন খারাপ। চূড়ান্ত ধাক্কা এল ৭ আগস্ট হিরোশিমাতে আর ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে। জাপান আত্মসমর্পণ করলো।

এখন সুভাষ কী করবে। রেঙ্গুন থেকে সে এসেছিলো সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর থেকে এল ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্ককে সুভাষের সাথে দেখা করতে এলেন জাপানি রাষ্ট্রদূত মি. হাচাইয়া। সঙ্গে জাপান সরকারের পাঠানো একটি জরুরি বার্তা। আত্মসমর্পণের খবর সত্য। তবে হিজ একসেলেন্সি চন্দ্র বোসের কোনো বিশেষ ইচ্ছা থাকলে জাপান তাতে সহযোগিতা করতে সর্বতোভাবে রাজি। সুভাষের বক্তব্য: জাপান পরাজিত। এ অবস্থায় জাপানের পক্ষে সহযোগিতা করা কতটুকু সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন শুধু একজন। তিনি হলেন সাইগনে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমান্ডের সর্বাধিনায়ক ফিল্ড-মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি। সুভাষ চলল সাইগনে। সাইগন থেকে তার যাওয়ার কথা হাইতিতে। কিন্তু হাইতি যাওয়ার আগেই যাত্রা বিরতি ঘটলো তুরান বিমানবন্দরে। কেন, কার নির্দেশে এই যাত্রা বিরতি ঘটলো জানা যায়নি।

১৮ আগস্ট ১৯৪৫। দুই ইঞ্জিনযুক্ত স্যালি ৯৭২ মডেলের বোমারু বিমানটি আকাশে উড়ল তুরান বিমানবন্দর থেকে। পরবর্তী লক্ষ্য সেই হাইতি। কিন্তু এবারও হাইতিতে অবতরণ করা হলো না। খবর পাওয়া গেল রাশিয়ার সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। হয়তো গোটা মাঞ্চুরিয়াই তারা দখল করে নেবে। তার আগে যে করে হোক মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন বন্দরে গিয়ে পৌছতে হবে। সুতরাং হাইতিতে না থেমে তারা চলল ফরমোসা দ্বীপের তাইহোকু বিমানবন্দরে।

তাইহোকু বিমানবন্দরে বিমান থেকে নেমে সবাই বিশ্রাম নিলেন একটি তাঁবুর নিচে। কিছু স্যান্ডুইচ ও কিছু পাকা কলা খেলেন সবাই মিলে।

ততক্ষণে বিমানে তেল ভরবার কাজ শেষ। নিয়মমতো বিমানটিকে পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে নানাভাবে। ইঞ্জিনে কি যেন একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল প্রথম দিকে। পরে সব ঠিক। এবার লক্ষ্য- দাইরেন।

বেলা তখন দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। বিমানটি রানওয়ে পার হয়ে দুশ'-তিনশ' ফুট ওপরে উঠেছে মাত্র। তারপর...

হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিমানটি খাড়াভাবে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হল।

তাইহোকুর একটি হাসপাতালে পরবর্তীতে সুভাষ মারা যায়- এটি হল জাপান সরকারের তথ্য। এ নিয়ে অশেষ বিতর্ক আছে। কেউ বিশ্বাস করে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কেউ বলে, না কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। কেউ বলে সুভাষ মারা গিয়েছিল, কেউ বলে সে আত্মগোপন করেছিল। সুভাষ মারা যায়নি এমনটা যারা খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তাদের প্রথম সারিতে আছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর মন্তব্য হল : সুভাষ এভাবে মারা যেতে পারে না।

১০.

নেতাজীর মৃত্যুটাই একটা বিতর্কিত বিষয়। এই বিতর্কের শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট থেকে। পরবর্তীতে এই বিতর্ক বেড়েছে, আরো নতুন বিতর্কের জন্ম হয়েছে কিন্তু তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।

নেতাজীর মৃত্যু বিতর্কের আগুনে নতুন জ্বালানী ঢেলে দিল মুখার্জী কমিশন।

নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য উদঘাটনে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ও সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি মনোজ মুখার্জী বলেছেন, ১৯৪৫ সালে তাইওয়ানে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হন বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য তদন্তে ইতিপূর্বে গঠিত দু'টি কমিটি ঐ দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন বলে জানালেও জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্তের জন্য ২ বছর আগে (২০০২) মুখার্জী কমিশন গঠন করা হয়।

সম্প্রতি তাইওয়ানে সফর করে আসা বিচারপতি মনোজ মুখার্জী বলেন, তাইওয়ান

সরকার আমাকে যেসব নথিপত্র দেখিয়েছে, তাতে ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সে দেশে কোনো বিমান দুর্ঘটনার প্রমাণ নেই।

সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা পুরবী রায়ও নেতাজীর এই তথাকথিত নিহত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, রুশ আর্কাইভে প্রাপ্ত কাগজপত্রে দেখা গেছে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হননি। টোকিওর রেনকোজিট মন্দিরে রক্ষিত 'নেতাজীর চিতাভস্মের' ব্যাপারেও তিনি দ্বিমত প্রকাশ করেন।

নেতাজীর সঙ্গে উত্তর প্রদেশে বসবাসকারী এক সন্ন্যাসীর অতিপ্রাকৃত সাদৃশ্যের কথা নিয়ে তৈরি করা এক প্রতিবেদন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। নেতাজী সুভাষ বসু সেই সন্ন্যাসী বাবা হয়েই এই পৃথিবীর বুকে আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন- এই ছিল রিপোর্টটির মোদ্দা কথা।

মুখার্জী কমিশনের ফরেনসিক প্রমাণগুলো নতুন এই ধারণার জন্ম দিয়েছে। ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। নেতাজীর রহস্যজনক মৃত্যু এবং ফরেনসিক গবেষণা- এই দুয়ের ওপর ভর করে নেতাজীর পুনঃআবির্ভাব ধারণা এসেছে। বলা হচ্ছে, নেতাজী গত কয়েক বছর রহস্যজনক সাধু হয়ে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করেছেন। 'গুমনামি বাবা' হয়েই তিনি আবার এই ভূ-পৃষ্ঠে এসেছেন। হস্তাক্ষর বিশারদরা নেতাজী বসুর হাতের লেখার সঙ্গে গুমনামি বাবার হাতের লেখার অতিপ্রাকৃত মিল খুঁজে পেয়েছেন। সেই সন্ন্যাসী ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মারা যাওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার পরও তার স্ত্রী এমিলি বসু বিশ্বাস করতেন তার স্বামী মারা যায়নি। কারণ তিনি খবর পেয়েছেন, ১৯৪৫ সালের পরও নেতাজীকে রাশিয়াতে দেখা গিয়েছিল। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতাজীর ভাইয়ের ছেলের মেয়ে সুরাইয়া কুমার বসু এ কথা জানান। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে এমিলি সুরাইয়াকে জানান যে, জার্মানির একজন সাংবাদিক রেমন্ড স্নাবেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পূর্ব বার্লিনে বসবাস শুরু করেন। ওই সাংবাদিক ১৯৫০ সালের শুরুর দিকে এমিলিকে বলেছিলেন, ১৯৪৫ সালের পর নেতাজীকে রাশিয়ায় দেখা গিয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরই রেমন্ড মারা যান। এমিলি ১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে মৃত্যুবরণ করেন।

এমিলি সুরাইয়াকে আরো বলেছিলেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মারা যাওয়ার কাহিনী ছিল সাজানো। বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজীর দেহের ভস্ম জাপানের রেনকোজি গির্জায় রাখা হয়েছে বলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়; কিন্তু ভারত সরকারের চাপের মুখেও এমিলি ওই ভস্মকে নেতাজীর হিসেবে মেনে নিতে কখনোই রাজি ছিলেন না।

১৯৫০ সালের দিকে নেপাল থেকে ভারতে আগমন ঘটে এক সন্ন্যাসীর। ভাগনজি নামের ওই সন্ন্যাসী নেপালে কর্মরত সংস্কৃতি বিষয়ের এক শিক্ষক মাহাদো প্রসাদ মিসরার মাধ্যমে ভারতের উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদ এলাকায় গিয়েছিলেন।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সন্ন্যাসী ভাগনজি আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে খুব বেশি মিল রয়েছে। ভাগনজি নেতাজীর মতোই কথা বলতেন, দেখতেও ছিল তার মতো, উচ্চতা, বয়স এমনকি নেতাজীর মতোই পড়ার অভ্যাস ছিল। শুধু তাই নয়, বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র, ছবি, স্যুভেনির যা শুধু বসু পরিবারেই থাকার কথা ছিল, তারও বেশকিছু অংশ ওই সন্ন্যাসীর ঘরে পাওয়া যায়।

ভাগনজির সময়কার অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। তারা জানান, ভাগনজিকে তারা 'গামনামি বাবা' বলেও জানতেন। তবে তিনি নিজেকে প্রায় সবসময় গোপন করে রাখতেন। খুব কম সময়ই ভাগনজি বাইরে বের হতেন। তাছাড়া কথা বলার সময় তিনি প্রায়ই পর্দার আড়ালে থাকতেন।

ভাগনজিই কি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু? এ প্রশ্নের জবাবে আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য সাক্ষ্য মিলে প্রসাদ নামে একজনকে লেখা তার একটি চিঠিতে। ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ওই চিঠিতে ভাগনজি লেখেন, তার অতীত জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পরিবার কিংবা বন্ধু-বান্ধবের কাছে তিনি মৃত। ওই চিঠিতে তিনি আরো উল্লেখ করেন... আমার মৃত্যু... একটি... রহস্য।

ভাগনজির সান্নিধ্যে আসা দু'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন ফয়জাবাদের জোতদার গুরবসন্ত সিং এবং ডা. প্রিয়ব্রত ব্যানার্জি। ব্যানার্জি হিন্দুস্তান টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৭৫ সালে তার বাবা ডা. টি ব্যানার্জি (ভাগনজির ব্যক্তিগত চিকিৎসক) ভাগনজির ঘরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তখন ভাগনজি তার বাবাকে বলেছিলেন, 'দেখো তো, কাহি মে সুভাষ চন্দ্র বসু তো নাহি হু?' (দেখো, আমি কি সুভাষ চন্দ্র বসু নই?) তখন বাবা তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকলে ভাগনজি বলেন, 'হু!' (আমিই)। ভাগনজি তার বাবাকে আরো বলেন, 'একটি জাতি থাকা সত্ত্বেও আমার কোনো জাতীয়তা নেই, গৃহ থাকা সত্ত্বেও আমি গৃহহীন, একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনোটিই নেই...

নেতাজীর দীর্ঘদিনের সঙ্গী দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডে ১৯৬৭ সালে ভাগনজির সঙ্গে একবার দেখা করেছিলেন। তখন তিনি ভাগনজিকে দেখেন একজন দাড়িওয়ালা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে। ওই সাক্ষাতে ভাগনজি তাকে বলেছিলেন, 'যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে নেতাজী হিসেবে ভাবতে পারো।' পরে পাণ্ডে ভাগনজিকে তার প্রকৃত পরিচয় প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে ভাগনজি বলেছিলেন, 'আমি একজন খাঁটি দশনামি সন্ন্যাসী।

অন্যদিকে ভাগনজির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে যে চিত্রটি পাওয়া গেল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভাগনজি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃতি এবং জার্মান ভাষা জানতেন। তিনি নেতাজীর অনুরূপ চশমা ব্যবহার করতেন। ভাগনজির কক্ষে নেতাজীর বাবার একটি ছবি এবং তার একটি ছাতা পাওয়া গিয়েছিল। নেতাজীর সহযোগীদের অধিকাংশই ছিলেন ভাগনজির অনুসারী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা পবিত্র মোহন রায়, লীলা রায়, সুনীল দাস, ত্রিলোক্যনাথ চ্যাটার্জি। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি (নেতাজীর জন্মদিন) ভাগনজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পবিত্র মোহন রায়সহ অনেকেই জড়ো হতেন তার কক্ষে। তাহলে ভাগনজিরূপেই কি ছিলেন নেতাজী! কারণ ১৯৮৫ সালে ভাগনজির মৃত্যুর পর কৌতূহলবশত ফয়জাবাদের কয়েকজন ব্যক্তি কোলকাতায় পবিত্র মোহন রায়ের বাসভবনে এসে সংবাদটি পৌঁছে দেন। তখন মি. রায় তাদের বলেছিলেন, 'আমি মুখ খুললে দেশে আগুন লেগে যাবে।'

১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন ভাগনজি। ১৮ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের ফয়েজাবাদ এলাকার সরাইউ নদীর তীরে গুপ্তর শ্মশানখলায় যখন তার মরদেহ সৎকার করা হচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত ছিল মাত্র ১৩ জন লোক। চিতায় আগুন জ্বলছে, সবাই চুপচাপ। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে একজন বলে উঠল, '... এখানে প্রায় ১৩ লাখ লোক থাকার কথা ছিল!'

৬ বছর পর দেখা যায় ভাগনজির দেহভস্ম যেখানে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল সে স্থানটি একটি পাথর দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়। ওই পাথরের গায়ে কেউ লিখে রেখেছেন 'গুম-নামি স্যান্ট'- অর্থাৎ নাম হারানো এক ব্যক্তি। হিন্দুস্তান টাইমসের এক সাংবাদিক সেখানে গেলে ওই শ্মশানের পাশে একটি ক্ষেতে কর্মরত এক কৃষককে ভাগনজির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি অবলীলায় বলেন, 'উনি তো সুভাষ চন্দ্র বসু।' তবে কেন তাকে এখানে সমাহিত করা হলো, তার জবাব তিনি জানেন না। শুধু ওই কৃষকই নন, ফয়েজাবাদের অনেক মানুষই জানেন না এ রহস্য।

হিন্দুস্তান টাইমস ভাগনজি এবং নেতাজীর হাতের লেখা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বি. লাল নামে এক বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করেছিল। তিনি জানান, 'ভাগনজি এবং নেতাজীর হাতের লেখায় একই স্টাইল ধরা পড়েছে।'

ভাগনজির মৃত্যুর পর যখন 'তিনিই নেতাজী' এই সংবাদ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন উত্তর প্রদেশের হাইকোর্ট ভাগনজির সব মালামাল সিল করে রাজ্য কোষাগারে সংরক্ষণের নির্দেশ দেন।

নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য তদন্তকারী মুখার্জী কমিশন ওই মালামাল থেকে কিছু হাতের লেখা এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন। কমিশন ইতিমধ্যে ভাগনজির একটি দাঁতের ডিএনএ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ওই ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য পরিপূর্ণভাবে উদঘাটিত হবে।

হিন্দুস্তান টাইমসের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মারা যাওয়ার খবর ছিল একটি কল্পকাহিনী।